BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

ওমিক্রণিক রূপান্তর

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

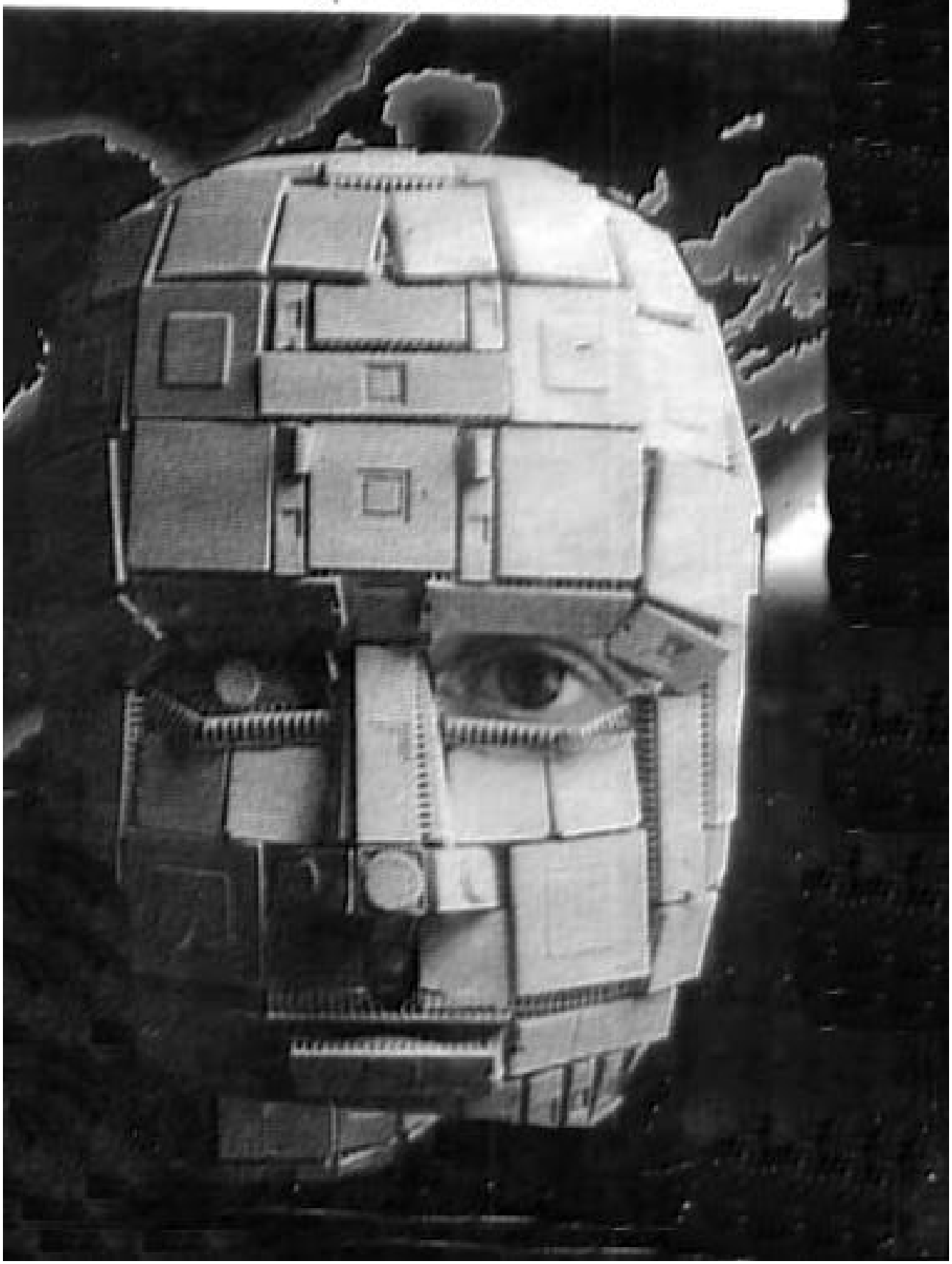

অভিজ্ঞানিক রূপান্তর

©
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
দ্বিতীয় মুদ্রণ
জানুয়ারি ১৯৯৫
তৃতীয় প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৯৫

প্রকাশক
শরীফ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
বিদেশী আলোকচিত্র অবলম্বনে কোলাজ
আহসান হাবীব

কম্পিউটার কম্পোজ
নূশা কম্পিউটার্স
৩৪ আজিমপুর সুপার মার্কেট, ঢাকা ১২০৫

মুদ্রণ
এস. আর. প্রিন্টার্স
৭ শ্যামাপ্রসাদ রায় চৌধুরী লেন, ঢাকা ১১০০

মূল্য : ৬০ টাকা

উৎসর্গ
বাংলাদেশের তরুণ
জাহানারা ইমাম
শ্রদ্ধাস্পদেষু

আহাম্মক

রিকির জন্যে অপেক্ষা না করেই বিজ্ঞান আকাদেমীর অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম অপেক্ষা করা হত আজকাল আর করা হয় না। সে অনেকদিন হল এইসব অধিবেশনে যোগ দেয়া ছেড়ে দিয়েছে। তাই আমরা হঠাৎ করে যখন অধিবেশনের মাঝখানে রিকি এসে হাজির হল সবাই একটু অবাক না হয়ে পারল না। রিকি সবার দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তার স্বভাব সুলভ উদ্ধত ভঙ্গীতে নিজের আসনে গিয়ে বসে। শব্দ করে তার হাতের ব্যাগ থেকে একটা ছোট পানীয়ের শিশি বের করে এক ঢোক খেয়ে শিশিটা টেবিলের উপর রাখে।

বৃদ্ধ সভাপতি রু সচরাচর রিকির উদ্ধত আচার আচরণকে সযত্নে এড়িয়ে যান, সবাই ভেবেছিল আজও তাই করবেন। কিন্তু রু কি কারণে জানি টেবিলে তার কাগজপত্র ভাঁজ করে রেখে শান্ত গলায় বললেন, রিকি, তুমি তিরিশ মিনিট দেরী করে এসেছ।

রিকি মুখে একটু হাসি টেনে আনার ভান করে বলল, জানি।

সে ক্ষেত্রে তোমার অধিবেশনে যোগ দেয়ার আগে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন আছে।

তাই নাকি? রিকি গলার স্বরে ব্যঙ্গটুকু আড়াল করার কোন চেষ্টা করল না।

এসব নিয়ম কানুন বেশীর ভাগই স্বাভাবিক ভদ্রতা, তুমি জান না এতে আমি খুব অবাক হই না। রু হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললেন, তোমার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন আছে রিকি।

রিকি কিংবা অন্য কেউই মহামান্য রু'কে এ রকম কঠিন স্বরে কথা বলতে দেখে নি। মুহূর্তের মাঝে পরিবেশটি আশ্চর্য রকম শীতল হয়ে যায়।

রিকি একটু বিপন্ন অনুভব করে, কষ্ট করে নিজের গলার স্বরকে স্বাভাবিক রেখে বলল, ঠিক আছে অনুমতি নিচ্ছি।

নাও।

আমি কি অধিবেশনে যোগ দিতে পারি?

রু তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, না।

ঘরে বজ্রপাত হলেও মনে হয় কেউ এত অবাক হত না। বিজ্ঞান আকাদেমীর সদস্যরা এত প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী যে পৃথিবীর শাসনতন্ত্র পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। রিকির ফর্সা মুখ অপমানে টকটকে লাল হয়ে যায়। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, আপনি আমাকে সবার সামনে অপমান করার চেষ্টা করছেন।

না।

তাহলে?

বিজ্ঞান আকাদেমীর তোমাকে আর প্রয়োজন নেই। তোমাকে এই ছোট একটি সত্যি কথা জানানোর চেষ্টা করছি।

সেই সত্যি কথাটি কার মাথা থেকে বের হয়েছে?

আমার।

আপনাকে কে এই ক্ষমতা দিয়েছে?

কেউ দেয়নি। রু আস্তে আস্তে বললেন, আমি নিজেই নিয়েছি।

বিজ্ঞান আকাদেমীর সদস্যদের ক্ষমতা প্রায় ঈশ্বরের মত। তাদেরকে আদেশ দেওয়া যায়না।

হ্যাঁ তাদের ক্ষমতা দিয়েছে পৃথিবীর সাধারণ মানুষ। তারা যখন দেখলে সেই ক্ষমতা অপব্যবহার করা হচ্ছে সে ক্ষমতা আবার নিয়ে নেবে। তুমি তোমার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছ রিকি।

কি করেছি আমি?

অনেকে কিছু করেছ। সবচেয়ে দুঃখজনক হল তোমার স্ত্রীর মৃত্যু। তুমি তাঁকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছ রিকি।

রিকি চমকে উঠে বৃদ্ধ রুয়ের মুখের দিকে তাকাল। রু শান্ত গলায় বললেন, সাধারণ মানুষ হলে তোমাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হত রিকি। বিজ্ঞান আকাদেমীর সদস্যরা সব নিয়ম কানুনের উর্দ্ধে তাই তোমাকে স্পর্শ করা হয়নি।

রিকি কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বলল, আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমি কে। আমি হচ্ছি সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও পণিতবিদ "আনাহাসু রিকিশান" সংক্ষেপে রিকি। চৌদ্দ বৎসর বয়সে আমি মহাজাগতিক সূত্রের সপ্তম সমাধান করেছি। সতেরো বছর বয়সে আমার নামে তিনটি ইনিস্টিটিউট খোলা হয়েছে। বাইশ বৎসর বয়সে আমি বিজ্ঞান আকাদেমীর সদস্য হয়েছি, সময়সূত্রের একমাত্র সমাধানটি আমার নিজের হাতে করা, নবম সূত্রের রিকি পরিভাষা ব্যবহারিক অংকের জন্য নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছে—

রু হাত তুলে তাকে থামালেন, বললেন, আমরা জানি তুমি অত্যন্ত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী।

আমার জন্য পৃথিবীর সাধারণ নিয়ম খাটে না মহামান্য রু। পৃথিবীর দুই চারটি সাধারণ মানুষের প্রাণ আমার ব্যক্তিগত খেয়াল থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার স্ত্রী অত্যন্ত নির্বোধ মহিলা ছিল।

আমি মৃতদের নিয়ে অসম্মানজনক কথা পছন্দ করি না, রিকি।

রিকি থতমত খেয়ে থেমে যায়, আস্তে আস্তে তার মুখের মাংসপেশী শক্ত হয়ে আসে। টেবিল থেকে পানীয়ের শিশিটি তুলে এক ঢোক খেয়ে হাতের উল্টো পৃষ্ঠা দিয়ে মুখ মুছে বলল, ঠিক আছে তাহলে জীবিত ব্যক্তিদের কথাই বলি। এই বিজ্ঞান আকাদেমী হচ্ছে একটা গন্ডমূর্খের আড্ডা। এখানকার সবাই হচ্ছে একজন স্তরে নির্বোধ। বিজ্ঞানের সবগুলির শাখায় আমি একা যে পরিমাণ অবদান রেখেছি আপনারা সবাই মিলে তার একশ ভাগের এক ভাগ অবদান রাখেননি।

সেটা নির্ভর করে তুমি অবদান বলতে কি বোঝাও তার উপর। রিকি তুমি ভুলে যাচ্ছ বিজ্ঞান আকাদেমীর সদস্যদের ব্যক্তিগত গবেষণার সময় কিংবা সুযোগ নেই।

আমাকে সেটা বিশ্বাস করতে বলছেন?

রু কোমল গলায় প্রায় হাসিমুখে বললেন, সেটা তোমার ইচ্ছে রিকি। কিন্তু তুমি যেহেতু বিষয়টি তুলেছ তোমাকে একটা ঘটনার কথা বলি। প্রায় কুড়ি বৎসর আগে পশ্চিমের পাহাড়ের অঞ্চলের একটা কৃষিজীবি এলাকার বাচ্চাদের স্কুল থেকে আমি একটা চিঠি পেয়েছিলাম। স্কুলের একজন শিক্ষকের চিঠি অনেক ঘুরে আমার কাছে এসেছিল। চিঠিতে শিক্ষক লিখেছেন তার ক্লাশে নাকি একজন অস্বাভাবিক প্রতিভাবান শিশু রয়েছে। আমি শিশুটির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার বয়স তখন সাত, সে ছয় বৎসর বয়সে মহাজাগতিক সূত্রের প্রথম সমাধানটি করেছিল। সাত বৎসর বয়সে সে সময়ে পরিভ্রমণের উপর প্রায় সঠিক একটা সূত্র দিয়েছিল। আমি তাকে এবং তার পরিবারকে রাজধানীতে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। বাচ্চাটি রাজী হয়নি। সে বিজ্ঞানে উৎসাহী নয়।

রিকি শক্ত মুখে বলল, কি নাম তার? কোথায় থাকে?

তাতে তোমার প্রয়োজন কি? তোমাকে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে সেই শিশুটি তোমার থেকে অনেক বেশী প্রতিভাবান ছিল। সে ইচ্ছে করলেই আমাদের সাথে এই সভায় থাকতে পারত। কিন্তু সে থাকেনি। যে বিজ্ঞান আকাদেমীর সদস্য হয়ে তোমার এত অহংকার, সেই শিশুটির তাতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। পৃথিবীতে তোমার থেকে অনেক বড় প্রতিভাবান মানুষ আছে, তবে হ্যাঁ, তোমার মত অহংকারী, ক্ষমতালোভী উচ্চাকাঙ্খী সম্ভবতঃ কেউ নেই।

রিকি কি একটা বলতে চাইছিল রু হাত তুলে তাকে থামিয়ে বললেন, প্রায় তিরিশ বৎসর আগে মহাজাগতিক মেঘ দিয়ে পৃথিবীতে একটা বিপর্যয় নেমে

আসার কথা ছিল। আমরা—এই বিজ্ঞান আকাদেমীর সদস্যরা সেই বিপর্যয় থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলাম, তুমি সেই ঘটনার কথা জান?

জানি।

পৃথিবীর ইতিহাসে সেই প্রচেষ্টার কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কেন থাকবে জান?

জানি।

না, তুমি জান না। তোমার জানার ক্ষমতা নেই। তুমি লোভী এবং স্বার্থপর। দশজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীর একসাথে কাজ করার কি আনন্দ তুমি কল্পনাও করতে পার না রিকি। পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের প্রচেষ্টার কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে কারণ আমরা সবাই একসাথে কাজ করে একটি ভয়ংকর বিপর্যয় থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলাম। বিজ্ঞানীদের জীবনে এর থেকে সার্থকতা কিছু নেই। ব্যক্তিগত সাফল্যের সাথে এর কোন তুলনাও হয় না। রিকি, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নেই। তুমি কিংবা তোমার মত একজন বিজ্ঞানী যে কাজের জন্যে এত অহংকারী হয়ে যাও তার প্রত্যেকটিই অন্য কয়জন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী কয়েক বৎসর চেষ্টা করে বের করে ফেলতে পারে। খুব দুঃখের ব্যাপার তুমি এই সহজ সত্যিটি জান না। তুমি আমাদের কোন কাজে আস না রিকি, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নেই। তুমি এখন যাও, ভবিষ্যতে আর কখনো এস না।

রিকি ভড়ঘড়ীর মত মুখ করে বলল, যদি না যাই?

যাবে। তুমি নিশ্চয়ই যাবে। তুমি অনেকদিন থেকে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ।

আপনি কেমন করে জানেন?

আমি জানি। আমি বিজ্ঞান আকাদেমীর সভাপতি, তাই আমার কাছে সব খবরা-খবর আসে। আমি না চাইলেও আসে। আমি জানি তুমি পৃথিবীর পুরো রাখিনিয়ামটুকু নিজের কাছে এনে জমা করেছ। তুমি এখন পালাবে। কোথায় পালাবে জানি না, কিন্তু তুমি পালাবে।

রিকি মুখে একটা ধূর্ত হাসি ফুটিয়ে বলল, আমি পালাব?

হাঁ। কারণ তুমি জান আমরা বিজ্ঞান আকাদেমীর নিয়ম কানুন পাল্টে ফেলছি। তোমার মত মানুষের যেন বিচার করা যায় তার ব্যবস্থা করছি।

রিকি এবারে উচ্চ স্বরে হেসে উঠে, আমাকে বিচার করবেন আপনারা? পৃথিবীর মানুষেরা? কখনো শুনেছেন পৃথিবীর মানুষ ঈশ্বরের বিচার করার চেষ্টা করছে?

রু কোন কথা না বলে ভুরু কুচকে রিকির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রিকি উঠে দাঁড়ায়। হাসতে হাসতে বলে, বেশ চেষ্টা করে দেখেন। আমি যাচ্ছি—এই নির্বোধদের আসরে আমার জন্যে থাকা আর সম্ভব নয়। বিদায়।

কেউ কোন কথা বলল না, রিকি দরজা খুলে সভাকক্ষ থেকে বের হয়ে গেল।

রিকি বের হয়ে যাবার পর কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। রু আস্তে আস্তে তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যে তোমরা এই উন্মাদ ব্যক্তিটির সাথে আমার কথোপকথনটি ধৈর্য ধরে শুনলে। তোমরা কেউ যে কোন কথা বলনি সে জন্যে আমি সারাজীবন তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

গণিতবিদ কিরি বললেন, আমরা আপনার ধৈর্য দেখে বিস্মিত হয়েছি মহামান্য রু। একটি ঘুষি দিয়ে তার সবকয়টি দাঁত খুলে না ফেলে কিভাবে তার সাথে কথা বলা যায় আমার জানা নেই।

অধিবেশন কক্ষে অনেকে উচ্চস্বরে হেসে উঠে। রসায়নবিদ নীথা তরল স্বরে বললেন, ভাগ্য ভাল যে তুমি কথা বলার চেষ্টা করনি, কিরি। এই বয়সী মানুষের মারপিট দেখতে ভাল লাগার কথা নয়।

আবার অধিবেশন কক্ষে মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল। রু বললেন, চল, কাজ শুরু করা যাক।

নীথা বলল, মাহমান্য রু, আপনি কি খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে চান? রিকির সঙ্গে কথা বলা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

ঠিকই বলেছ! মিনিট পনেরোর জন্যে বিরতি নেয়া যাক। কি বল?

সবাই আনন্দে রাজী হয়ে যায়।

* * *

সন্ধ্যেবেলা মহামান্য রু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন, এমন সময় তার সহকারী মেয়েটি নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়। রু ঘুরে তাঁর দিকে তাকালেন, কিছু বলবে?

কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক আপনার সাথে দেখা করতে চান। কি নাকি জরুরী ব্যাপার।

রু অন্যমনস্কভাবে বললেন, আসতে বল।

প্রায় সাথে সাথেই তথ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক এসে হাজির হলেন। বয়স্ক ভদ্রলোক, কপালের দুপাশে চুলে পাক ধরেছে। কমনীয় চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত এভাবে বিরক্ত করার জন্য।

রু হাসিমুখে বললেন, কে বলেছে তুমি বিরক্ত করছ? তোমার কাছে আমি যে সব মজার খবর পাই আর কোথায় সেগুলি পাব বল।

আমি খুব দুঃখিত মহামান্য রু, কিন্তু একটা খবর জানানোর জন্যে আমার নিজের আসতে হল।

কি খবর? রিকি কিছু করেছে?

আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। মহামান্য রিকি তার গোপন গবেষণাগারে কুরু মহাকাশযানের একটি ইঞ্জিন নিয়ে গেছেন।

সেটা কি জিনিষ?

কুরু মহাকাশযানের ইঞ্জিন অত্যন্ত মূল্যবান জিনিষ। একটি শেষ করতে প্রায় ছয় বছর সময় নেয়। প্রচন্ড ক্ষমতাশালী ইঞ্জিন আন্তঃ নক্ষত্র ভ্রমণ ছাড়া অন্য কোন ব্যবহার নেই। মহামান্য রিকি কি কাজে ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই।

রু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, রিকি এখন পালাবে। তুমি দেখ সে পালাবে। খুব ভয় পেয়েছে আজ।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক কোন কথা বললেন না, বিজ্ঞান আকাদেমীর সদস্যদের নিয়ে কৌতুহল দেখানো শোভন নয়। রু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ঘুরে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে জানানোর জন্যে। ইঞ্জিনটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে আর লাভ নেই, ধরে নাও ওটা গেছে। আমি মহাকাশ কেন্দ্রের সাথে কথা বলে একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেব।

অনেক ধন্যবাদ মহামান্য রু। তথ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন রু তাকে থামালেন। জিজ্ঞেস করলেন, রিকি এখন পর্যন্ত কি করেছে না করেছে তুমি তো সব জান?

জানি।

তার স্ত্রীকে হত্যা করা, রথোনিয়াম জড়ো করা, মুদ্রা অপসারণ, এখন কুরু মহাকাশযানের ইঞ্জিন—

পরিচালক ভদ্রলোক মাথা নীচু করে বললেন, জ্বি জানি।

তুমি খুব সাবধানে এইসব খবর বাইরের পৃথিবীর কাছে গোপন রেখেছ?

জি। বিজ্ঞান আকাদেমীর সদস্যদের অবমাননা করে কোন ধরণের খবর প্রকাশ করা আমাদের নীতির বিরুদ্ধে।

রু একটু ভেবে বললেন, রিকি আজ কালকের ভিতরে উধাও হয়ে যাবে। কোথায় যাবে ঠিক বলা যাচ্ছে না, কিন্তু উধাও হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে উধাও হবার পর তার সম্পর্কে তুমি যা যা জান সবকিছু খবরের কাগজে প্রকাশ করে দিতে পারবে?

পরিচালক ভদ্রলোক ভয়ানক চমকে উঠলেন, কি বলছেন আপনি?

রু শান্ত গলায় বললেন, পারবে?

আপনি যদি বলেন নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু

কিন্তু কি?

বিজ্ঞান আকাদেমীর সদস্যরা আমাদের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁরা পৃথিবীর জন্যে যে অবদান রেখেছেন তার কোন তুলনা নেই, তাদের কোন একজন যদি ছোটখাট কোন ভুলত্রুটি করে থাকেন সেটা সারা পৃথিবীকে জানানোর সত্যিই কি কোন প্রয়োজন আছে?

রু আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, আছে। বিজ্ঞান আকাদেমীর সদস্যরা ঈশ্বর নয়, তারা মানুষ। তাদের সাধারণ মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া ঠিক না। তুমি আমার এই অনুরোধটি রাখ।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক বিদায় নেওয়ার পর রু অনেকক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন, বিজ্ঞান আকাদেমীর কাঠামোতে একটি বড় রদবদল করতে হবে, এভাবে আর চালানো যায় না। আজ একজন রিকি বের হয়েছে ভবিষ্যতে যদি দশজন রিকি বের হয় তখন কি হবে?

সহকারী মেয়েটি নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করে বলল, মহামান্য রু আপনার জন্য কিছু খাবার আনব?

না, এইতো খেলাম একটু আগে। বয়স হয়ে গেলে বেশী খিদে পায় না।

তাহলে কোন ধরণের পানীয়? ফলের রস বা অন্য কিছু?

না, না কিছু লাগবে না। আমার জন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ো না। যদি পার তাহলে দেখ আমাদের যাদুঘরের মহা পরিচালককে কোথাও পাওয়া যায় কি না। জরুরী কিছু নয়, এমনি একটু কথা বলব।

সহকারী মেয়েটি হাসি গোপন করে সরে গেল। মহামান্য রু নিজে থেকে একজন মানুষের সাথে দেখা করতে চাইছেন এর থেকে জরুরী খবর পৃথিবীতে কি কিছু হতে পারে? কোমল স্বভাবের এই বৃদ্ধ কি সত্যি জানেন কি প্রচন্ড তার ক্ষমতা?

কিছুক্ষণের মাথেই রু তার ঘরের হলোগ্রাফিক্স স্ক্রীনে যাদুঘরের মহাপরিচালককে দেখতে পেলেন। মহাপরিচালক দুই হাতে নিজের টুপি ধরে রেখে ফ্যাকাশে মুখে বললেন, মহামান্য রু, আপনি আমায় খোঁজ করছিলেন?

হ্যাঁ করছিলাম। জরুরী কোন কাজে নয় এমনি একটা কাজে। কথার সুর পাল্টে বললেন, আপনার যাদুঘর কেমন চলছে?

ভাল, খুব ভাল। তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে মহাপরিচালকের মুখে কথা জড়িয়ে যায়, গত মাসে আমরা নতুন একটা সভ্যতা আবিষ্কার করেছি, বিস্ময়কর একটা সভ্যতা। অংশ বিশেষ আমাদের যাদুঘরে আনা হয়েছে।

তাই নাকি? একদিন আসতে হয় দেখতে।

আসবেন? আপনি আসবেন মহামান্য রু? মহাপরিচালকের চোখ উত্তেজনায় চক চক করতে থাকে, আপনি শুধু আমাকে জানান কবে আসবেন।

আমার নাত্নী আমার সাথে দেখা করতে আসবে সামনের সপ্তাহে। তাকে নিয়ে আসব। নাত্নীর বয়স ছয়। সে কিছুতেই যাদুঘরে যেতে চাইবে না, বলবে

চিড়িয়াখানাতে নিয়ে যেতে। আমি অবশ্যি যাদুঘরেই আসব। আমার খুব ভাল লাগে যাদুঘরে যেতে।

যাদুঘরের মহাপরিচালক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না। কি বলবেন বুঝতে না পেরে প্রায় চিৎকার করে বললেন, যাদুঘরকে আমরা নতুন করে সাজাব। নতুন করে—

সে কি!

জ্বি। আপনি আসবেন কত বড় সম্মান আমাদের যাদুঘরের জন্যে। মহামান্য রু আপনার প্রিয় রং কি?

কেন?

আপনার প্রিয় রং দিয়ে পুরো যাদুঘর আমরা নূতন করে রং করে নেব।

সে কি! রু ব্যস্ত হয়ে বললেন, পুরো যাদুঘর রং করে ফেলবেন মানে? আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

মহাপরিচালক একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, আপনার জন্য কিছু একটা করতে চাই আমরা, আপনি আপত্তি করবেন না মহামান্য রু। আপনাকে বলতেই হবে কি রং আপনার প্রিয়।

রু এবার হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, সব রংই আমার পছন্দ। ক্যাটক্যাটে হলুদ একটা রং আছে সেটা বেশী ভাল লাগে না, তা ছাড়া—

সব হলুদ রং সরিয়ে নেবো আমরা। পুরো ব্লকে কোন হলুদ রং থাকবে না। পুরো। শহরে—

না না সেটা করবেন না—কিছুতেই না।

তাহলে বলেন আপনার প্রিয় রং।

নীল, হালকা নীল।

নীল! যাদুঘরের মহাপরিচালক উত্তেজিত হয়ে উঠেন, আমারও প্রিয় রং হালকা নীল! কি যোগাযোগ! কত বড় সৌভাগ্য আমার। পুরো যাদুঘর নতুন করে সাজাব—অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর করে—

রু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তার কিছু করার নেই। যাদুঘরের মহাপরিচালকের ভাবাবেগ একটু কমে আসার পর বললেন, আপনার কাছে আমি একটা জিনিষ জানতে চাইছিলাম।

বলুন মহামান্য রু।

আপনারা যাদুঘরের পক্ষ থেকে কয়েক বছর পর পর পৃথিবীর ছোটখাট ব্যবহার্য জিনিষ একটা বাক্সে করে মাটির নীচে পুঁতে রাখেন বলে শুনেছি। ভবিষ্যতের মানুষ দেখবে, দেখে আমাদের সময় সম্পর্কে একটা ধারণা করবে সে জন্যে। ব্যাপারটা সত্যি নাকি?

সত্যি মহামান্য রু। আমরা দশ বছর পর পর এটা করে থাকি। গতবার আপনার লেখা একটা বই আমরা সেখানে রেখেছিলাম।

সেখানে কি কি জিনিষ রাখা হয়?

সাম্প্রতিক ছায়াছবি, গানের রেকর্ড, জনপ্রিয় বই, খাবার, খেলনা, পোষাক এই ধরণের জিনিষ।

কোন খবরের কাগজ কি রাখা হয়?

জি, আমরা খবরের কাগজও রাখি। খবরের কাগজ এবং সাময়িকী।

এবারের কোন খবরের কাগজটি রাখবেন সেটি কি ঠিক করেছেন?

না এখনো ঠিক করিনি।

আমি যদি বিশেষ একটি খবরের কাগজের কথা বলি আপনারা কি সেটি রাখবেন?

অবশ্যি অবশ্যি রাখব। আপনি একটি খবরের কাগজ রাখতে চাইবেন আমরা সেটি রাখব না সেটি কি কখনো হতে পারে? মহামান্য রু, আপনার জন্য যে কোন কাজ করতে পারলে আমরা আমাদের জীবন ধন্য হয়ে গেছে মনে করি। কোন কাগজটি রাখতে চাইছেন?

সেটি এখনো বের হয়নি, আজ কালের ভিতরে বের হবে। সেখানে বিজ্ঞান আকাদেমীর একজন সদস্য সম্পর্কে কিছু খবর থাকবে। অনেক ব্যক্তিগত খবর। খবরটা ভাল হবে না, দেখে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে। সেই খবরের কাগজটা রাখতে পারবেন?

অবশ্যই অবশ্যই—

যাই হোক, আপনি এখন কাউকে কিছু বলবেন না।

অবশ্যই বলব না, কাউকে বলব না, কিছুতেই বলব না। যাদুঘরের পরিচালক প্রচন্ড কৌতূহলে ভিতরে ভিতরে ফেটে গেলেও সেটা বাইরে প্রকাশ করার সাহস পেলেন না।

রু আস্তে আস্তে বললেন, ঠিক আছে তাহলে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে খানিক্ষণ সময় ব্যয় করার জন্য।

যাদুঘরের মহা পরিচালক মাথা নীচু করে অভিবাদন করে বিদায় নিয়ে হলো—গ্রাফিক স্ক্রীন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

* * *

রিকি সবুজ রংয়ের সুইচটা স্পর্শ করতেই কানে তালা লাগানো শব্দে ইঞ্জিনটা চালু হল। কুরু মহাকাশযানের ইঞ্জিন—হাইপার ডাইভের জন্যে তৈরি, তার প্রচন্ড শব্দে পুরো গবেষণাগার থর থর করে কাঁপতে থাকে। রিকি খানিক্ষণ অপেক্ষা করে ইঞ্জিনটাকে পুরোপুরি চালু হবার সময় দিল। সামনের প্যানেলে সবুজ বাতিটি জ্বলে

উঠতেই সে লাল রংয়ের হ্যান্ডেলটা নিজের দিকে টেনে ধরে সাথে সাথে সমস্ত শব্দ হঠাৎ যাদুমন্ত্রে মত থেমে যায়। রিকি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, কিন্তু ভাল করে দেখা যায় না, কেমন যেন কুয়াশার মত আবছায়া। সে এখন স্থির সময়ের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। স্থির সময়ের ক্ষেত্র থেকে অন্য কোন সময়ে পরিভ্রমণ করার কথা। রিকি দুই হাজার বছর সামনে এগিয়ে যেতে চায়—বর্তমান বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞান তার জন্যে যথেষ্ট নয়। দুই হাজারের বেশী আগে যাওয়া সম্ভবতঃ নিরাপদ নয়—মানুষের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন হয়তো এতো বেশী হয়ে যাবে যে রিকি তাল মিলিয়ে থাকতে পারবে না।

রিকি সাবধানে কিছু সংখ্যা কন্ট্রোল বোর্ডে প্রবেশ করাতে থাকে। এই সংখ্যাগুলি তাকে দুই হাজার বছর ভবিষ্যতে নিয়ে যাবে। ভবিষ্যতের মানুষ অতীত থেকে আসা এই অসাধারণ বিজ্ঞানীকে দেখে বিস্ময়ে কেমন হতবাক হয়ে যাবে। চিন্তা করে রিকির মুখে হাসি ফুটে উঠে। তাকে প্রথম যখন অভিবাদন করবে উত্তরে বুদ্ধিদীপ্ত একটা কথা বলতে হবে, কি বলা যায়?

কন্ট্রোল প্যানেলে সংখ্যাগুলি দ্রুত পাল্টাতে থাকে। প্রতি মিনিটে রিকি একটি করে শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণ, তারপর রিকি পৌঁছে যাবে দুই হাজার বছর ভবিষ্যতে! না জানি কত রকম বিস্ময় অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

* * *

ইঞ্জিনের গর্জন থেমে যাবার পর রিকি সাবধানে চেয়ার থেকে নিজেকে মুক্ত করে দরজা খুলে দিল। দরজার ও পাশে দুজন ফ্যাকাসে চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে। লম্বায় তার থেকেও প্রায় অনেকটুকু উঁচু। গায়ে অর্ধস্বচ্ছ এক ধরণের পোশাক, নিশ্চয়ই কোন আশ্চর্য পলিমারের তৈরি। কোমর থেকে যে জিনিষটা ঝুলছে সেটাকে দেখে এক ধরণের অস্ত্র বলে মনে হয়।

রিকি হাতের ছোট মাইক্রোফোনে মুখ লাগিয়ে বলল, আমি অতীত থেকে তোমাদের জন্যে শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছি।

মাইক্রোফোনটি শক্তিশালী অনুবাদকের সাথে যুক্ত—দুই হাজার বছরে ভাষার যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা হিসেব করে সঠিক ভাষায় পাল্টে দেয়ার কথা।

লোক দুটি একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। একজন তার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে এগিয়ে গিয়ে পরিষ্কার রিকির ভাষায় বলল, শুভেচ্ছা পরে হবে, আগে ফর্মটাতে তোমার নাম ঠিকানা লিখ—

রিকি উত্তপ্ত হয়ে বলল, তুমি বুঝতে পারছ না—

লোকটি বাধা দিয়ে বলল, খুব বুঝতে পারছি যে তুমি একজন বড় বিজ্ঞানী। যারা অতীত থেকে আসে সবাই দাবি করে তারা বড় বিজ্ঞানী। প্রতিদিন অন্ততঃ দু'চার জন করে আসছে কাজেই আমাদের এত সময় নেই। ভবিষ্যতে আসা সোজা

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে অতীতে যাওয়া যায় না। তাহলে ধরে ধরে সবগুলিকে ফেরত পাঠাতাম। তুমি কি ভাব তোমার এই আজব ভাষায় কথা বলতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে?

রিকি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এটা কি ধরনের অভ্যর্থনা।

লোকটি গলার স্বর উঁচু করে বলল, তাড়াতাড়ি নাম ঠিকানা লিখ, কেন এসেছ কি বৃত্তান্ত সব কিছু। কোয়ারান্টাইনে নিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করতে হবে এখন কি কি রোগ জীবাণু এনেছ সাথে?

রিকি কাঁপা হাতে ফর্মটি পূরণ করতে থাকে। নিজের চোখ কানকে তার বিশ্বাস হয় না, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সে অথচ তার সাথে এমনভাবে ব্যবহার করছে যে সে একজন তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধী।

ফর্মটি পূরণ করে রিকি লোকটির হাতে দেয়। লোকটি ভ্রূ কুঁচকে পুরোটা চোখ বুলিয়ে হাতের উল্টো পৃষ্ঠার ছোট মাইক্রোফোনে কথা বলতে থাকে, অতীত থেকে আরেকজন এসেছে। দাবী করছে সে বিজ্ঞান আকাদেমীর সদস্য ছিল। মনে আছে একজন দাবী করেছিল সে নাকি যীশু খ্রীষ্ট! হাঃ হাঃ হাঃ।

রিকি লোকটার কথা বুঝতে পারে না কিন্তু ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করছে। রিকি বুঝতে পারে প্রচণ্ড ক্রোধের সাথে সাথে আরো একটা অনুভূতি তার ভিতরে ছড়িয়ে পড়ছে, যেটার সাথে তার ভাল পরিচয় নেই—অনুভূতিটি ভয়ের।

দ্বিতীয় লোকটি তার পকেট থেকে চৌকোণ একটা যন্ত্র বের করে ফর্মটি দেখে দেখে রিকির নামটি লিখতে থাকে। রিকি কৌতূহলী হয়ে তাকাল, সম্ভবতঃ একটি কম্পিউটার, কোন কেন্দ্রীয় ডাটা বেসের সাথে যুক্ত। তার সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছে।

লোকটি নিস্পৃহ দৃষ্টিতে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ কিছু একটা দেখে চমকে উঠল, চোখ বড় বড় করে তাকাল একবার রিকির দিকে। তারপর আবার তাকালো স্ক্রীনের দিকে।

তোমার নামে আমাদের একটা ফাইল আছে।

আমার নামে?

হ্যাঁ। ফাইলে একটা খবরের কাগজের কাটিংও আছে। সেখানে তোমার সম্পর্কে বড় খবর। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট করে পালিয়ে গিয়েছিলে, স্ত্রীকে খুন করেছিলে নিজের হাতে। লেখা আছে তুমি অনেক বড় ক্রিমিনাল।

লোক দুটির গায়ে প্রচণ্ড জোর, খুব সহজে রিকির হাত দু'টি পিছনে টেনে হাত কড়া লাগিয়ে দিল। সামনে যাবার ইঙ্গিত করে একজন মাথা নেড়ে বলল, আমি জীবনে অনেক আহাম্মক দেখেছি, কিন্তু তোমার মত আহাম্মক আর দেখিনি।

রিকি মাথা নীচু করে এগিয়ে যায়।

সময়ের অপবলয়

অভ্যাসমত দরজায় তালা লাগানোর পর হঠাৎ করে রিগার মনে পড়ল আজ আর ঘরে তালা লাগানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। সে যেখানে যাচ্ছে সেখান থেকে সে সম্ভবতঃ আর কোনদিন ফিরে আসবে না। ব্যাপারটি চিন্তা করে একটু আবেগে আপ্লুত হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু রিগার সেই সময়টাও নেই। এখন রাত তিনটা বেজে তেতাল্লিশ মিনিট, আর ঘন্টা দুয়েকের মাঝেই ভোরের আলো ফুটে উঠবে। সে যেটা করতে যাচ্ছে তার প্রথম অংশটা ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই শেষ করতে হবে।

ছোট ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে রিগা নীচে নেমে এল। বাকী জিনিষগুলি আগেই বড় ভ্যানটিতে তুলে নেয়া হয়েছে। সে গত পাঁচ বছর থেকে এই দিনটির জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে, খুটি নাটি সবকিছু অসংখ্যবার যাচাই করে দেখা হয়ে গেছে কোথাও কোন ভুল হবার অবকাশ নেই, তবে ভাগ্য বলে যদি সত্যি কিছু থাকে এবং সেই ভাগ্য যদি বেঁকে বসে তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। ছোট ব্যাগটা পাশে রেখে রিগা তার ভ্যানটির সুইচ স্পর্শ করা মাত্র সেটি একটি ছোট ঝাঁকুনী দিয়ে চলতে শুরু করে। কোন রাস্তা কোথায় যেতে হবে বহুকাল আগে প্রোগ্রাম করে রেখেছে। ভ্যানটি নিঃশব্দে সেদিকে যাত্রা শুরু করে দেয়। নিরীহ দর্শন এই ভ্যানটি দেখে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু এটি অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা রাখে।

আবাসিক এলাকার ছোট রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে ভ্যানটি হ্রদের তীরের বড় রাস্তায় উঠে পড়ল। রাস্তাটি এরকম সময় নির্জন থাকে। একেবারে মাটি খুঁড়ে যাওয়া যায়। এই এলাকার শীতকালে হাড় কাঁপানো কনকনে ঠান্ডা বাতাস হু হু করে বইতে থাকে, বসন্তের শুরুতে এতটা খারাপ হবার কথা নয়। রিগা জানালাটা একটু নামিয়ে দেখল, হ্রদের ঠান্ডায় ভিজে বাতাসের সাথে সাথে সারা শরীর শিউরে উঠে। রিগা দ্রুত আবার জানালাটা তুলে দেয়। দু'হাত একসাথে ঘসে শরীরটা একটু গরম করে সে আকাশের দিকে তাকাল। শুক্ল পক্ষের রাত, আকাশে ভাঙ্গা একটা চাঁদ উঠেছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রিগার মনটা হঠাৎ একটু বিষন্ন হয়ে যায়। পরিচিত এই পৃথিবীটার জন্যে—যেটা কখনো ভাল করে তাকিয়ে দেখেনি, তার হঠাৎ বুকটা টন টন করতে থাকে।

রিগা জোর করে নিজেকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনে। একটু পরেই সে যে জিনিষটি করতে শুরু করবে তার খুটিনাটি মনে মনে আরো একবার যাচাই করে দেখতে থাকে।

* * *

ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল এভাবে।

সংবিধানে দু'শ বছর আগে একটা সংশোধনী যোগ করা হয়েছিল। সংশোধনীটা এরকমঃ "১৯ শে এপ্রিলের বিপর্যয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী পৃথিবীর স্বার্থের পরিপন্থী।"

সংশোধনীটি বিচিত্র, কিন্তু এই সংশোধনীটির জন্যে যেটা ঘটল সেটি আরো বিচিত্র। পৃথিবীর তথ্য নিয়ন্ত্রণকারী যাবতীয় কম্পিউটার পৃথিবী থেকে ১৯শে এপ্রিলের বিপর্যয় সংক্রান্ত সকল তথ্য সরিয়ে নিতে শুরু করল। একশ বছর পর পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিপর্যয়ের উপর আর কোন তথ্য থাকল না। আরো একশ' বছর আছে কোন এক এপ্রিল মাসের উনিশ তারিখে পৃথিবীতে কোন এক ধরণের বিপর্যয় ঘটেছিল। যেহেতু এ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য পৃথিবীর স্বার্থের পরিপন্থী কাজেই সংবিধানের এই সংশোধনটিও হঠাৎ একদিন সরিয়ে নেয়া হল। ব্যাপারটি ঘটেছিল প্রায় পনেরো বছর আগে, তখন রিগার বয়স তিরিশ।

হঠাৎ করে সংশোধনটি সরিয়ে নেবার পর ব্যাপারটি নিয়ে অনেকেরই কৌতূহল হয়েছিল। সান্ধ্য খবরের বিশেষ রেম কার্ড বের হল যেটা নিয়ে সবাই হলোগ্রাফিক স্ক্রীনে জল্পনা কল্পনা করতে থাকে। তরুণ অনুসন্ধানীরা কম্পিউটারে ঘাটাঘাটি করে নানারকম তত্ত্ব দিতে শুরু করে। কেউ বলল জিনেটিক পরিবর্তন করে এক ধরনের অতিমানব তৈরি করা হয়েছিল যারা পৃথিবী ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কেউ বলল গ্রহান্তরের আগন্তুক পৃথিবীতে হানা দিয়ে তার নিয়ন্ত্রণ নিতে চেয়েছিল। আবার কেউ বলল, বায়োকেমেস্ট্রির এক ল্যাবরেটরী থেকে ভয়ংকর এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর জীব জগৎকে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়েছিল। সবই অবশ্য উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা, কারণ এইসব তত্ত্বকে সত্যি বা মিথ্যা প্রমাণ করার মত কোন তথ্যই পৃথিবীর ডাটা বেসে নেই, সব একেবারে ঝেড়ে পুছে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

বছর খানেক পর সবার কৌতূহল থিতিয়ে এল। শুধুমাত্র জল্পনা কল্পনা করে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ১৯ শে এপ্রিলের বিপর্যয় সংক্রান্ত তথ্য পৃথিবীর স্বার্থের পরিপন্থী বলে সেটা নিয়ে প্রকাশ্যে গবেষণা করাও সম্ভব নয়, কোন কম্পিউটারই সাহায্য করতে পারে না। তার ফলে, বছর দুয়েকের মাঝেই পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই ১৯ শে এপ্রিলের বিপর্যয় অজ্ঞাত থেকে যাবে এই সত্যটি মোটামুটিভাবে মেনে নিল, একজন ছাড়া, সেটি হচ্ছে রিগা।

রিগা এমনিতে কম্পিউটারের ড্রোন ভাষার উপর কাজ করে। ভাষাটি সহজ নয়, এই ভাষায় প্রোগ্রাম করায় যে কয়টি বাড়তি সুবিধে তাতে পৃথিবীর মানুষের বেশী উৎসাহ নেই। কাজেই সে পৃথিবীর প্রথম সারির একজন প্রোগ্রামার হয়েও মোটামুটিভাবে সবার কাছে অপরিচিত। ড্রোন ভাষার বৈশিষ্ট হচ্ছে এটি সমস্যাকে কখনো সোজাসুজি সমাধান করার চেষ্টা করে না, কাজেই সবাই হাল ছেড়ে দেবার পরও রিগা কম্পিউটারে ১৯শে এপ্রিল বিপর্যয়ের তথ্য খুঁজে বেড়াতে থাকে। কম্পিউটার তাকে সন্দেহ করে না সত্যি কিন্তু সে কোন তথ্য খুঁজেও বের করতে পারে না। এইভাবে আরো দুই বৎসর কেটে যায়।

রিগার বয়স যখন চৌত্রিশ, পারিবারিক ব্যাপারে বিশেষ মন দেয় না বলে তখন তার স্ত্রীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তাদের একমাত্র ছেলেটিকে নিয়ে তার স্ত্রী একদিন পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠে চলে গেল। হলোগ্রাফিক স্ক্রীনে ছেলেটিকে প্রায় সত্যিকার মানুষের মতই জীবন্ত দেখায় কিন্তু মাঝে মাঝে রিগার খুব ইচ্ছে করত ছেলেটিকে খানিক্ষণ বুকে চেপে ধরে রাখে। কিন্তু ছেলেটি ধীরে ধীরে তার কাছ থেকে সরে যেতে থাকে। আজকাল হলোগ্রাফিক স্ক্রীনেও তার দেখা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এরকম সময়ে রিগা একদিন তার ছেলের সাথে দেখা করতে গেল।

রিগা তার ছেলের কাছে একজন অপরিচিত মানুষের মত, তাই সংগত কারণেই ছয় বছরের এই শিশুটি তার বাবাকে দেখে খুব বেশী উচ্ছাস দেখালো না। রিগা খানিক্ষণ কথা বলার চেষ্টা করে খুব সুবিধে করতে পারল না, শিশুদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় সে জানে না। ছেলের সাথে ভাব করার আর কোন উপায় নেই দেখে রিগা এক সময়ে তার পকেট থেকে রেম কার্ডটি বের করে, সেখানে দৈনন্দিন খবর ছাড়াও প্রাগৈতিহাসিক জন্তু জানোয়ারের উপর একটি দুর্লভ অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত এই শিশুটির মন জয় করতে সক্ষম হয়। ঘরের মাঝখানে সত্যিকার জীবন্ত প্রাণীদের মতো হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবিগুলি দেখে বাচ্চাটি হাত তালি দিয়ে লাফাতে থাকে। বাচ্চাদের হাসি থেকে সুন্দর কিছু নেই, কিন্তু রিগার যে জিনিষটি প্রথমে চোখে পড়ল সেটি হচ্ছে তার ফোকলা দাঁত। ছয় বছর বয়সে শিশুদের দুধ দাঁত পড়ে নতুন দাঁত ওঠা শুরু করে। বাচ্চাটির দাঁত সবে পড়েছে এখনো নূতন দাঁত উঠেনি, তাই প্রতিবার হাসার সময় ফোকলা দাঁত বের হয়ে পড়ছে।

বাচ্চাটির ফোকলা দাঁতটি দেখে হঠাৎ করে রিগা বুঝতে পারে ১৯ শে এপ্রিলের রহস্য কেমন করে সমাধান করতে হবে। রহস্যটি হচ্ছে বাচ্চাটির ফোকলা দাঁতের মতন, সেটি নেই কারণ তার সম্পর্কে সব তথ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কেউ যদি সেটাকে খুঁজে কখনো কিছু পাবে না। কিন্তু ফোকলা দাঁতের অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, কারণ প্রত্যেকবার হাসার সময় দেখা যাচ্ছে একটি দাঁত নেই। ১৯ শে এপ্রিলের রহস্যও ঠিক সেরকম, সেটি সম্পর্কে

কোন তথ্য নেই কিন্তু অন্য সব তথ্যগুলিকে খুঁজে দেখলেই দেখা যাবে সেখানে একটা অসম্পূর্ণতা রয়েছে। সেই অসম্পূর্ণতাই হচ্ছে ১৯শে এপ্রিলের রহস্য। যে কাল্পনিক তথ্য সেই অসম্পূর্ণতাকে দৃঢ় করতে পারবে সেই তথ্যই হবে এই রহস্যের সমাধান।

রিগা পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টা তার ছেলের সাথে সময় কাটালেও মনে মনে সে পরবর্তী কর্মপন্থা ছকে ফেলল। ড্রোন ভাষায় যে নূতন কম্পিউটার প্রোগ্রামটি লিখতে হবে সেটির কাঠামোও সে মনে মনে ঠিক করে নিল। বহুদিন পর সে বুকের ভিতর কৈশোরের উত্তেজনা অনুভব করতে থাকে।

কম্পিউটার প্রোগ্রামটি দাঁড়া করাতে এবং বছর খানেক সময় লেগে গেল, সেটি থেকে ভুল ত্রুটি সরিয়ে পুরোপুরি কাজের উপযোগী করতে লাগল আরো দুই বছর। তৃতীয় বছরের গোড়ার দিকে রিগা প্রথমবার তার প্রোগ্রামটি পৃথিবীর বড় বড় ডাটা বেসে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিল। সুদীর্ঘ সময় ব্যয় করে সেটি জানাল, পৃথিবীর তথ্য ভান্ডারে যে সব তথ্যের মাঝে বড় ধরনের অসংগতি রয়েছে সেগুলি দূর করা যায় যদি এই কয়টি জিনিষ কল্পনা করে নেয়া যায় ঃ—

(এক) আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে পাশাপাশি দু'টি শহরে ব্রিনি ও লীক নামে দু'জন মানুষের জন্ম হয়েছিল।

(দুই) প্রায় সমবয়সী এই দুজন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিল।

(তিন) তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল সময়ের অপবলয়।

(চার) প্রায় দুশ পনেরো বছর আগে ব্রিনি ও লীক সময়ের অপবলয় সংক্রান্ত একটি পরীক্ষা করার চেষ্টা করে। পরীক্ষাটি ঠিকভাবে শেষ হয়নি।

(পাঁচ) তারা যেখানে পরীক্ষাটি করেছিল সেখানে সম্ভবতঃ একটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। সম্ভবতঃ সেখানে তারা একটি সুড়ঙ্গের মত সৃষ্টি করেন যেটি বিশ্বব্রহ্মান্ডের বাইরের সাথে যোগাযোগ করে দেয়।

(ছয়) ব্রিনি ও লীক সেই সুড়ঙ্গ পথে বিশ্বব্রহ্মান্ডের বাইরে ছিটকে পড়েন কারণ তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি।

(সাত) এই সুড়ঙ্গের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়, কারণ সমস্ত পৃথিবী এই পথ দিয়ে গলে বের হয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

বিস্ময়কর এই তথ্য রিগার কৌতূহলকে নিবৃত্ত না করে আরো বাড়িয়ে দেয়। সত্যিই কি ব্রিনি ও লীক বিশ্বব্রহ্মান্ডের বাইরের সাথে একটি সুড়ঙ্গ মুখ খুলে দিয়েছেন? সত্যিই কি সেই পথে বেরিয়ে যাওয়া যায়? সত্যিই কি পুরো পৃথিবী এই পথে বের হয়ে যেতে পারে?

এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার একটি মাত্র উপায়। ব্রিনি ও লীক যেখানে পরীক্ষাটি করেছিলেন সেটি খুঁজে বের করা।

রিগার জন্যে খুব কঠিন হল না। দেখা গেল ত্রিনি ও লীক সেই পরীক্ষাটি করেছিলেন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের একটি কক্ষে। সেই কক্ষটি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে তাকে ঘিরে প্রায় চল্লিশ বর্গমাইল এলাকার উপর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের পাথর এবং কংক্রীট ঢালা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের হ্রদের তীরে যে ছোট পাহাড়টি বসন্তকালে অসংখ্য ফুলে ঢেকে যায় সেটি একটি কৃত্রিম পাহাড়, এই তথ্যটি পৃথিবীতে রিগা ছাড়া আর কেউ জানে না। পাহাড়ের প্রায় হাজার দুয়েক ফুট নীচে একটি ছোট বিজ্ঞানাগারে ত্রিনি ও লীক একটি অসাধারণ পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই পরীক্ষাটি কি ধরণের বিপর্যয়ের সূত্রপাত করেছিল আজ রিগা সেই রহস্য ভেদ করতে যাচ্ছে।

এর জন্যে রিগা প্রায় পাঁচ বছর প্রস্তুতি নিয়েছে। প্রথমতঃ সে তার কাজ বদল করে উত্তরাঞ্চলের সেই শহরে চলে এসেছে। শহরের একপাশে হ্রদ অন্য পাশে ছোট পাহাড়টি গ্রীষ্মকালে অনেক ভ্রমণবিলাসী মানুষকে আকর্ষণ করে কিন্তু এমনিতে সারা বছর এটি বেশ নিরিবিলি। ছোট এই শহরে ভ্রোন ভাষায় অভিজ্ঞ কম্পিউটার প্রোগ্রামের উপযোগী কোন কাজ নেই বলে সে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের একটি কারখানায় কাজ করে। অবসর সময় সে শব্দ তরঙ্গ দিয়ে ঘনত্ব মাপার একটা যন্ত্র তৈরি করেছে, সেই যন্ত্রটি দিয়ে ধীরে ধীরে সে পুরো পাহাড়টি পর্যবেক্ষণ করেছে। পাহাড়ের নীচে কোথায় সেই রহস্যময় গবেষণাগারটি লুকিয়ে রয়েছে সেটাও খুঁজে বের করেছে। সেই গবেষণাগারে পৌঁছানোর জন্যে পাহাড়ের কোন অংশ দিয়ে যাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ সেটাও নির্ধারণ করেছে। পাহাড় কেটে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে ভিতরে ঢুকে যেতে কি ধরণের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন অনুমান করার চেষ্টা করেছে। তারপর সেই সব যন্ত্রপাতি দিয়ে এই ভ্যানটি তৈরি করেছে। নিরীহ দর্শন এই ভ্যানটির ভিতরে রয়েছে চারটি শক্তিশালী কুরু ইঞ্জিন। প্রয়োজনে সামনের অংশটি খুলে সেখান থেকে কার্বন হীরের পাথর কাটার একটা অতিকায় ড্রিল বের হয়ে আসে। শক্তিশালী ইঞ্জিনের প্রচণ্ড ঘূর্ণনে সেই ড্রিল পাথর কেটে পুরো ভ্যানটাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে যাবে। ভ্যানের মাঝে রয়েছে শক্ত পাম্প, সামনের কাটা পাথর সেটি সরিয়ে আনে পিছনে। পাহাড়ের যে অংশ দিয়ে রিগা ভিতরে ঢুকবে সে অংশটি লতাগুল্ম দিয়ে ঢাকা। কেউ সেদিকে যায় না, যাবার রাস্তাও নেই। কেউ সহজে জানতে পারবে না যে রিগা এদিক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। প্রবেশ পথ ঢেকে থাকে কাটা পাথরে, বসন্তের বৃষ্টিতে নতুন গাছগাছালি গজিয়ে ঢেকে ফেলবে সেই জায়গা।

হ্রদের তীর দিয়ে ঘুরে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছাতেই রিগা তার ভ্যানের হেড লাইট নিভিয়ে দিল। তার হিসেব মত চাঁদ ডুবে গিয়ে চারিদিকে এখন গাঢ় অন্ধকার। রিগা খানিক্ষণ অপেক্ষা করে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে যে কেউ তার পিছু নেয়নি। তারপর অন্ধকারেই ভ্যানটিকে চালিয়ে গাছগাছালীর ভিতর দিয়ে পাহাড়ের গাদদেশে এনে হাজির করলো। আজকের অভিযানের প্রথম অংশ পরিকল্পনা মতই কোন সমস্যা ছাড়া শেষ হয়েছে।

রিগা সাবধানে ভ্যান থেকে নেমে তার ইনফ্রারেড চশমাটি পরে নেয়, সাথে সাথে অন্ধকার দ্রবীভূত হয়ে চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠে। রিগা সাবধানে চারিদিকে তাকায়, কোথাও কিছু নেই, শুধুমাত্র একটি নিশাচর র‍্যাকুন খানিক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা গাছের গুড়িতে লুকিয়ে যায়। রিগা কয়েক পা এগিয়ে যায়, অনেক ধরণের যন্ত্রপাতিতে বোঝাই বলে ভ্যানটি মাটির উপরে উঠতে পারে না, সময় সময় চাকার গর্ত রেখে আসে। তাকে এখন সাবধানে এইসব চাকার দাগ মুছে ফেলতে হবে রিগা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে তার কাজ শুরু করতে এগিয়ে যায়।

হিসেব মত ভোর পাঁচটা দশ মিনিটে রিগা তার ভ্যানটি চালু করল। ঠিক এই সময়ে শহরের বড় জেনারেটরটি চালু করা হয় তার শক্তিশালী ভ্যানটি পাথর কেটে ভিতরে ঢুকে যাবার সময় বাড়তি যে কম্পন সৃষ্টি করবে সেটা ধরা পড়বে না। রিগা ঘড়ি দেখে ঠিক সময়ে ভ্যানের কন্ট্রোল প্যানেলের নির্দিষ্ট সুইচটি স্পর্শ করে, সাথে সাথে সামনের অংশটি খুলে অতিকায় ড্রিলটি বের হয়ে আসে, প্রচণ্ড ঘূর্ণন সৃষ্টি হয় তারপর সেটি পাথর স্পর্শ করে। আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে ড্রিলটি পাথর কেটে ছোট একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলল। ভ্যানটি ধীরে ধীরে পাহাড়ের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাবার সময় রিগা একবার পিছনে তাকাল, ইনফ্রারেড চশমায় অন্ধকার পৃথিবীটিকে তার কাছে অলৌকিক মনে হয়। এই পৃথিবীটিকে সে হয়তো আর কোনদিন দেখবে না। পৃথিবীর সাথে তার কোন যোগাযোগ রইল না কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে রেখে আসা তার ডাইরীটা ছাড়া। সেই ডাইরীর খোঁজ কখনো কি কেউ পাবে?

*

রিগা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকে। ভ্যানটি প্রচণ্ড গর্জন করে একটি অতিকায় গুয়োপোকার মত পাথরে গর্ত করে নির্দিষ্ট দিকে এগুতে থাকে।

* * *

ল্যাবরেটরী ঘরের সামনে ভ্যানটি দাঁড় করিয়ে রিগা মাস স্পেকট্রোমিটারটি চালু করে। বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার উপযোগী যথেষ্ট অক্সিজেন রয়েছে। কিন্তু বিষাক্ত কোন গ্যাস রয়েছে কিনা জানা দরকার। তার কাছে অক্সিজেন মাস্ক রয়েছে কিন্তু সেটা ব্যবহার করতে না হলে কাজকর্মে সুবিধে হয়। রিগা স্পেকট্রোমিটারটির স্ক্রীনে ভাল করে তাকায়, বিচিত্র কিছু গ্যাস রয়েছে, রেগেনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশী কিন্তু বিষাক্ত কোন গ্যাস নেই। রিগা জানালা অল্প একটু খুলে নিঃশ্বাস নেয়, একটু ঝাপসা গন্ধ বাতাসে কিন্তু খানিক্ষনেই অভ্যাস হয়ে যাবার কথা।

ল্যাবরেটরীর সামনে দু'শ বছরের ভারী পুরানো এক কাঠের দরজা। সম্ভবতঃ সে সময়ে এরকম দরজার প্রচলন ছিল। দরজার উপর ধূলায় ধূসর একটি সাইন বোর্ড সেখানে বড় বড় করে লেখা, "প্রবেশ নিষেধ, আইন অমান্যকারীকে তাৎক্ষণিক মৃত্যুদন্ড।"

রিগা চারিদিকে তাকায়, এক সময় নিশ্চয়ই আশেপাশে কড়া পাহারা ছিল, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে প্রহরীরা তাৎক্ষণিক মৃত্যুদন্ড কার্যকরী করার জন্যে অপেক্ষা করত। দু'শ পনেরো বছর পর সেই প্রহরীরা নেই, কিন্তু অন্য কোন ধরনের সাবধানতা এখনো অবশিষ্ট রয়েছে কিনা কে জানে। রিগা সাবধানে পরীক্ষা করে কিছু না পেয়ে হাতের ক্লাস্টার দিয়ে দরজাটি খুলে ফেলল।

ভিতরে একটা লম্বা করিডোর। হাতের আলোটা উপরে তুলে রিগা চারিদিকে তাকাল। দূরে একটা দরজা। করিডোরের দেয়ালে কিছু ছবি, কিছু পুরানো কম্পিউটারের মনিটর। ধূলায় সব কিছু ঢেকে আছে। রিগা সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে যায়। সমস্ত ল্যাবরেটরীতে সমাধীক্ষেত্রের নীরবতা।

করিডোরের শেষ মাথার দরজাটিও বন্ধ। বাইরে আরেকটা সাইন বোর্ড, সেখানে আবার বড় বড় করে সাবধান বাণী লেখা। ভিতরে প্রবেশ নিষেধ এবং প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তাৎক্ষণিক মৃত্যুদন্ড। পাশে একটি নোটিশ বোর্ড, রিগা সাবধানে ধূলা ঝেড়ে ভিতরে তাকাল। ভিতরে একটা ছবি চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের দু'জন হাসিখুশী মানুষ একটি চতুষ্কোণ বাক্সের মত জিনিষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নীচে লেখা, প্রফেসর ত্রিনি ও প্রফেসর লীক তাদের সময় অপচয় ক্ষেত্রের সামনে। দু'জনই নিরীহ এবং হাসিখুশী চেহারার মানুষ, প্রফেসর ত্রিনির সামনের চুল হালকা হয়ে এসেছে, প্রফেসর লীকের মুখে বেমানান গোঁফ।

রিগা দীর্ঘ সময় ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। এই দুজন সেই রহস্যময় বিজ্ঞানী যারা নিজেদের অগোচরে সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিলেন, যারা বিস্ময়কর এক সুড়ঙ্গ পথে বিশ্বব্রহ্মান্ডের বাইরে ছিটকে পড়েছেন। রিগা আজ আবার পরীক্ষা করবে সেই বিস্ময়কর সুড়ঙ্গপথ। সে নিজেও কি ছিটকে পড়বে বিশ্বব্রহ্মান্ডের বাইরে? সেও কি সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে যাবে নিজের অগোচরে?

করিডোরের দরজাটি ভাল করে পরীক্ষা করে রিগা খুব সহজেই তার ক্লাস্টারটি দিয়ে খুলে ফেলল। ভিতরে বিশাল একটা হলঘরের মত, চারিদিকে অসংখ্য অতিকায় যন্ত্রপাতি আবছা আলোতে ভূতুড়ে একটা জায়গার মত লাগছে। রিগা সাবধানে পা ফেলে ভিতরে এগিয়ে যায়। হল ঘরের মাঝামাঝি চতুষ্কোণ বাক্সের মত ছোট একটা ঘর। চারিদিক থেকে অসংখ্য যন্ত্রপাতি, নানারকম তার এবং কেবল এই ঘরের মাঝামাঝি এসে জমা হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে এটাই হচ্ছে সময়ের অপচয় ক্ষেত্র। ঘরটা ঘুরে ঘুরে রিগা খুব ভাল করে পরীক্ষা করল। এক

পাশে গোলাকার একটা দরজা, অসংখ্য স্ক্রু দিয়ে সেটি শক্ত করে লাগানো। দেখে মনে হয় এই স্ক্রুগুলি পরে লাগানো হয়েছে। রিগা ভাল করে দরজাটি পরীক্ষা করল। মাঝামাঝি জায়গায় বিভিন্ন ভাষায় ছোট একটি ঘোষণাপত্র লাগানো রয়েছে, তাতে লেখা "এই দরজার অন্য পাশে যা রয়েছে সেটি এ পাশের কারো জানার কথা নয়। অন্য পাশের একটি পরমাণুও যদি পৃথিবীর এই অংশে উপস্থিত হয় সমস্ত পৃথিবী ধ্বংসের সম্ভাবনা রয়েছে আপনি যেই হয়ে থাকুন এই দরজা স্পর্শ না করে ফিরে যান।"

রিগা তার ব্যাগ নীচে নামিয়ে রেখে কাছাকাছি জায়গায় পা মুড়ে বসে পড়ে। সে কি দরজায় স্পর্শ না করে ফিরে যাবে? সেটি তো হতে পারে না, এত কষ্ট করে এতদূর এসে সে রহস্য ভেদ না করে যেতে পারে না। পৃথিবী ধ্বংস হোক সেটা সে চায় না, কিন্তু প্রফেসর ত্রিনি এবং লীক তো পৃথিবী ধ্বংস না করেই এই রহস্যের সৃষ্টি করেছেন, সে কেন পারবে না?

রিগা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দরজাটি লক্ষ্য করে। ছোট ছোট করে অনেক কিছু লেখা রয়েছে, গোলাকার দরজাটি দেখেও কিছু আন্দাজ করা যায়। এই দরজাটি কয়েকটা স্তরে ভাগ করা রয়েছে ভিতরের একটি পরমাণুকেও বাইরে আসতে না দিয়ে একজন মানুষের ভিতরে ঢোকা সম্ভব তার জন্যে সে রকম প্রস্তুতি নিতে হবে। অত্যন্ত জটিল এবং সময় সাপেক্ষ কাজ শুরু করার আগে রিগা একটু বিশ্রাম নিয়ে নেবে ঠিক করল।

ব্যাগ থেকে কিছু শুকনো খাবার বের করে সে খেয়ে নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজলো।

পাহাড়ের নীচে দুই হাজার ফুট পাথরের আড়ালে সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এত বড় একটা রহস্যের মুখোমুখি এসে চট করে চোখে ঘুম আসতে চায় না, কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শরীর এত ক্লান্ত হয়েছিল যে সত্যি এক সময় তার চোখ বুঁজে এল।

তার ঘুম হল ছাড়া ছাড়া ভাবে, সারক্ষণই স্নায়ু ছিল সজাগ, তাই একটুতেই ঘুম ভেঙ্গে সে পুরোপুরি জেগে উঠেছিল। তবুও ঘন্টা দুয়েক পর সে খানিকটা সতেজ অনুভব করে। উঠে বসে সে দরজার কাছে এগিয়ে যায়। এই দরজার অন্য পাশে রয়েছে সেই রহস্যময় জগৎ, সাবধানে তাকে সেই রহস্যের উন্মোচন করতে হবে। যন্ত্রপাতি নামিয়ে সে কাজ শুরু করে।

দরজাটি অনেকটা মহাকাশযানের দরজার মত, মহাকাশের পুরোপুরি বায়ুশূন্য পরিবেশে যাবার আগে যে রকম একটা ছোট কুঠুরীতে ঢুকে সেটাকে সবকিছু থেকে আলাদা করে ফেলতে হয় সে রকম। প্রথম দরজাটি খুলে সে একটা ছোট কুঠুরীতে ঢুকে, বাইরের দরজা বন্ধ করে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ পুরোপুরি কেটে দেবার পরই শুধু পরবর্তী দরজাটি খোলা সম্ভব। এর ফলে বাইরের জগৎ

থেকে কোন কিছু ভিতরে আসতে পারলেও, ভিতর থেকে কিছু বাইরে যেতে পারবে না। বাইরে সেটা নিয়েই বড় সাবধান বাণী লেখা রয়েছে ভিতর থেকে যেন একটি পরমাণুও বাইরে আসতে না পারে।

দরজার পরবর্তী স্তরটি আরো জটিল। বিদ্যুৎ প্রবাহ ছিল না বলে সেটা সম্পূর্ণ ব্যবহারের উপযোগী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু রিগার ব্যাগের ছোট একটা জেনারেটর তাকে উদ্ধার করল। দ্বিতীয় স্তরটি থেকে তৃতীয় স্তরে যেতে তার পুরো তিন ঘন্টা সময় বের হয়ে গেল। তৃতীয় স্তরে কাজটি তুলনামূলক ভাবে সহজ। স্ক্রুগুলি খুলে হাতলে চাপ দিতেই দরজাটি খুব সহজে খুলে গেল। ভিতরে আলো জ্বলছে। রিগা দরজাটি উন্মুক্ত করে ভিতরে উঁকি দিল।

ঘরের ঠিক মাঝামাঝি অংশে কিছু জটিল যন্ত্রপাতিতে উবু হয়ে বসে আছে দুজন মানুষ, দরজা খোলার শব্দ শুনে মাথা ঘুরে তাকিয়েছে দুজন রিগার দিকে। রিগা চিনতে পারল দুজনকেই একজন প্রফেসর ত্রিনি আরেকজন প্রফেসর লীক। গত দুশ পনেরো বছরে তাদের চেহারার কোন পরিবর্তন হয়নি। প্রফেসর ত্রিনি ভুরু কুঁচকে রয়েছেন, মনে হচ্ছে কোন কারণে খুব বিরক্ত হয়েছেন এগিয়ে এসে বললেন, ভিতর আসতে কাউকে নিষেধ করেছি তুমি জান না?

বাচনভঙ্গী ভিন্ন ধরনের গত দুশ বছরের ভাষার বেশী পরিবর্তন হয়নি কিন্তু বাচনভঙ্গী অনেকটুকু পাল্টেছে। পরিবর্তনটুকু খুব সহজে রিগার কানে ধরা পড়ল।

প্রফেসর ত্রিনি আবার বললেন, তোমাকে তো আগে কখনো দেখিনি, কার সাথে তুমি কাজ কর?

রিগা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, যন্ত্রপাতির মাঝে উবু হয়ে বসে থেকে প্রফেসর লীক বললেন, ত্রিনি, দেখবে এস্ট্রনেটেনে কোন পাওয়ার নেই।

পাওয়ার নেই? কি বলছ তুমি? প্রফেসর ত্রিনি দ্রুত লীকের কাছে এগিয়ে গেলেন, বললেন, একটু আগেই তো ছিল।

তোমাকে আমি বলেছিলাম না এই পাওয়ার সাপ্লাইগুলি একেবারে যাচ্ছে তাই। একটু লোড বেশী হলেই ধ্বসে যায়। এখন দেখ কি যন্ত্রণা—

প্রফেসর ত্রিনি মাথা চুলকে বললেন, তাইতো দেখছি। ভাবলাম পাওয়ার সাপ্লাইয়ে পয়সা নষ্ট করে লাভ কি—

এখন বোঝ ঠ্যালা, পুরোটা খুলে ওটা বের করে আনতে জানটা বের হয়ে যাবে না?

আমাকে দাও আমি করছি প্রফেসর ত্রিনি বড় একটা পাওয়ার স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। রিগা যে কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সেটা মনে হচ্ছে দুজনেই পুরোপুরি ভুলে গেছেন।

রিগা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডারে বড় বড় করে লেখা ১৯শে এপ্রিল, মঙ্গলবার। উপরে বড় একটা ঘড়িতে সময় দেখানো হচ্ছে, সকাল সাড়ে এগারোটা, এই চতুষ্কোণ ঘরটিতে সময় স্থির হয়ে আছে এবং এই দুজন বিজ্ঞানী সেটা জানেন না। রিগা তার ঘড়ির দিকে তাকাল, এই ঘরটিতে পা দিয়েছে মিনিট খানেক পার হয়েছে, পৃথিবীতে এর মাঝে কত সময় পার হয়ে গেছে?

প্রফেসর ত্রিনি এবং লীক চতুষ্কোণ একটা বাক্সের মত কি একটা জিনিষ খুলে টেনে বের করার চেষ্টা করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন, এবারে একটু বিরক্ত হয়ে রিগাকে বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে দেখছ কি, একটু হাত লাগাও না।

রিগা একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, প্রফেসর ত্রিনি এবং প্রফেসর লীক, আপনাদের দুজনকে আমার খুব একটা জরুরী জিনিষ বলার রয়েছে।

তার গলার স্বরের জন্যেই হোক বা দুশ পনেরো বছরের পরিবর্তিত বাচনভঙ্গীর জন্যেই হোক দুজনেই কেমন জানি একটু চমকে উঠলেন। তাদের চোখে হঠাৎ কেমন একটি আশঙ্কা ফুটে উঠল। ভাল করে রিগার দিকে তাকালেন প্রথম বারের মত—কিন্তু একটা অসঙ্গতি আঁচ করতে পারলেন দুজনেই। প্রফেসর লীক ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি কে? কেন এসেছ এখানে?

আমার নাম রিগা। আমি এখানে এসেছি একটা কৌতূহল মেটানোর জন্যে—

কি কৌতূহল? তোমার কথা এরকম কেন? কোন অঞ্চল থেকে এসেছ তুমি?

তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনারা কতক্ষণ আগে এই ঘরে ঢুকেছেন?

কেন?

আমি জানতে চাই—

এই আধা ঘন্টার মত হবে, প্রফেসর ত্রিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন, এগারোটার সময় ঢুকেছি, এখন সাড়ে এগারোটা। কেন কি হয়েছে?

বাইরে, এই আধা ঘন্টা সময়ে অনেক কিছু হয়ে গেছে।

কি হয়েছে? কি?

দুশ পনেরো বছর সময় পার হয়ে গেছে।

কথাটি তারা বুঝতে পারলেন বলে মনে হল না, অবাক হয়ে দুজনে বিস্ফোরিত চোখে রিগার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাদের চোখে প্রথমে অবিশ্বাস তারপর হঠাৎ করে বোবা আতঙ্ক এসে ভর করে। প্রফেসর ত্রিনি ছুটে এসে রিগার কলার চেপে ধরেন, চীৎকার করে বলেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ, মিথ্যা কথা—

রিগা নিজেকে মুক্ত করে বলল, না প্রফেসর ত্রিনি।

আমার কাছে আজকের খবরের বুলেটিন আছে। দেখবেন?

প্রফেসর ত্রিনির উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই রিগা হাতের রেম কার্ডটির সুইচ অন করে দিল, সাথে সাথে ঘরের মাঝখানে মিষ্টি চেহারার একজন মেয়ের জীবন্ত ত্রিমাত্রিক ছবি ভেসে উঠে। দিন তারিখ সন বলে খবর বলতে শুরু হয়ে যায়।

প্রফেসর ত্রিনি এবং লীকের বিস্ফোরিত চোখের সামনে রিগা সুইচ টিপে রেম কার্ডটি বন্ধ করে দিল। খবরের বিষয় বস্তু নাকি ত্রিমাত্রিক ছবির এই বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি কোনটি তাদের বাকহারা করে দিয়েছে বোঝা গেল না। খুব সাবধানে প্রফেসর লীক একটা গোলাকার আসনে বসে পড়ে প্রফেসর ত্রিনির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ত্রিনি মনে আছে, আমরা আরেকটা সলিউশান পেয়েছিলাম বিশ্বাস করিনি তখন। সেটাই কি সত্যি? কিন্তু সেটা তো অসম্ভব—

প্রফেসর ত্রিনি ফ্যাকাশে মুখে নিজের মাথা চেপে ধরে বসেছিলেন, আস্তে আস্তে বললেন, আজ বিকেলে আমার মেয়ের জন্মদিন। আমার কেক কিনে নিয়ে যাবার কথা ছিল—দশ বছর আগে ছিল সেটা? দশ বছর?

তিনি হঠাৎ নিজের মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

রিগা খুব ধীরে ধীরে শোনা যায় না এরকম গলায় বলল, আমি দুঃখিত প্রফেসর ত্রিনি। খুবই দুঃখিত।

প্রফেসর ত্রিনি হঠাৎ মুখ তুলে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর কঠোর মুখে বললেন, আমি বিশ্বাস করি না। আমি বাইরে যাব—

প্রফেসর লীক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ত্রিনির দিকে। তারপর বললেন, ত্রিনি তুমি তো জান, যদি দ্বিতীয় সমাধানটি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে তুমি বাইরে যেতে পারবে না—

কে বলেছে পারব না, একশবার পারব।

কিন্তু তাহলে সময় সমাপনী নীতির লংঘন হবে।

হোক।

তার মানে তুমি জান—বস্তু আর অবস্থানের অবলুপ্তি ঘটবে। তুমি থাকবে কিন্তু তোমার চারপাশের পৃথিবী উড়ে যাবে।

যাক—আমার কিছু আসে যায় না। আমি বাইরে যাব।

প্রফেসর ত্রিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, রিগা পিছন থেকে তাকে ডাকল, প্রফেসর ত্রিনি, আমার ধারণা আপনি বাইরে যেতে পারবেন না। আপনি চাইলেও পারবেন না।

কেন?

আমি এখানে এসেছি প্রায় সাত মিনিটের মত হয়ে গেছে। তার মানে জানেন?

কি?

পৃথিবীতে আরো পঞ্চাশ বছর সময় পার হয়ে গেছে।

প্রফেসর ত্রিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন, তাতে কি হয়েছে?

আমি এখানে এসেছি গোপনে, কেউ জানে না। কিন্তু আমার ডাইরীটা আমি রেখে এসেছি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে। সেটা এতদিনে পৃথিবীর মানুষ পেয়েছে।

পেলে কি হবে?

তারা জানবে আমি এই ল্যাবরেটরী সবগুলি দরজা খুলে ভিতরে এসে ঢুকেছি, আপনারা এখন ইচ্ছে করলে বের হয়ে যেতে পারবেন। পৃথিবীর মানুষ সময়ের অপব্যয়ের সূত্রের সমাধান করেছে তারাও জানে দ্বিতীয় সমাধানটি সত্যি। তারাও এখন জেনে গেছে এই ছোট ঘরে আমরা তিনজন স্থির সময়ের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি, আমরা বের হয়ে গেলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা সেটা হতে দেবে না। কিছুতেই হতে দেবে না।

কি করবে তারা?

ক্লাউকে পাঠাবে এখানে। যারা আমাদের তিনজনকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে পৃথিবীকে রক্ষা করবে।

কাকে পাঠাবে? প্রফেসর ত্রিনির গলা কেঁপে গেল হঠাৎ।

আমার ধারণা, সেঞ্চুরী—৪৯ ধরনের রবোটকে। অত্যন্ত নিখুত রবোট, অত্যন্ত সুচারু কাজ করতে সক্ষম। আমার ধারণা যে কোন মুহূর্তে তারা এসে ঢুকবে এখানে।

বিশ্বাস করি না তোমার কথা। বিশ্বাস করি না—

রিগা কি একটা বলতে চাইছিল, তার আগেই হঠাৎ সশব্দে দরজা খুলে যায়। দরজায় চারটি ধাতবমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। মূর্তিগুলি মাথা ঘুরিয়ে তাদের তিনজনকে এক নজর দেখে নেয়। তারপর খুব ধীরে ধীরে হাতের অস্ত্র তাদের দিকে উদ্যত করে।

রিগা ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার অনুমান তাহলে ভুল হয়নি।

কখনো হয় না।

বিষ

ক্রায়োজেনিক পাম্পটি চালিয়ে দিয়ে কিম জিবান কাঁচের ছোট এম্পুলটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তার সুদীর্ঘ জীবনে তিনি কখনো একটা স্ক্রু ড্রাইভার হাতে একটা স্ক্রু ঘুরিয়েছেন মনে পড়ে না, অথচ গত এক সপ্তাহ থেকে তার ঘরে একটা ছোট কিন্তু জটিল ল্যাবরেটরী বসানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পরিষদের দশজন সদস্যের একজন হিসেবে তার ক্ষমতার আক্ষরিক অর্থেই কোন সীমা নেই। মূল কম্পিউটার তার মুখের কথায় এই ল্যাবরেটরীর প্রতিটি জিনিষ এনে হাজির করেছে। কিন্তু কাঁচের এম্পুলটিতে তিনি যে তরল পদার্থটি রাখতে চাইছেন সেটি কিভাবে তৈরী করতে হয় সেই তথ্যটি তিনি মুখের কথায় বের করতে পারেননি। সে জন্যে তাকে নিজের হাতে তার সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পরিষদের গোপন সংখ্যাটি মূল কম্পিউটারে প্রবেশ করাতে হয়েছে। পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে এখন পর্যন্ত কেউ সেটি করেছে বলে জানা নেই। এজন্যে তাকে সামনের কাউন্সিলে জবাব দিহি করতে হবে, সেটি গ্রহণযোগ্য না হলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তার নিজের প্রাণ নেয়ার কথা।

জিবান স্থির দৃষ্টিতে কাঁচের এম্পুলটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। হালকা লাল রংয়ের একটা তরল এক ফোটা এক ফোটা করে কাঁচের এম্পুলটিতে জমা হচ্ছে। পুরোটুকু ভরে যাওয়ার পর এম্পুলটির মুখ লেজারের এক ঝলক আলোতে গলিয়ে বন্ধ করে ফেলার কথা। তিনি কখনো আগে এ ধরনের কাজ করেননি তাই নিজের চোখে দেখে নিশ্চিত হতে চান।

এম্পুলটির মুখ বন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি সেটা হাতে নেয়ার জন্যে ক্রায়োজেনিক পাম্পটা বন্ধ করে দেন। ভিতরে বাতাসে চাপ স্বাভাবিক হওয়ার পর তিনি বায়ু নিরোধক বাক্সটির ঢাকনা খোলার জন্যে হাতল স্পর্শ করা মাত্র মূল কম্পিউটারটি আপত্তি জানাল। পৃথিবীতে মাত্র দশজন মানুষকে এই ঢাকনা খোলার অধিকার দেয়া হয়েছে, কিম জিবানকে দ্বিতীয়বার তার নিজের হাতে গোপন সংখ্যাটি প্রবেশ করিয়ে কম্পিউটারকে জানাতে হল তিনি সেই দশজন মানুষের একজন। বায়ু নিরোধক বাক্সটির ঢাকনা এবার সহজেই খুলে আসে, জিবানের হাত অল্প অল্প কাঁপতে থাকে, তিনি সে অবস্থাতেই সাবধানে এম্পুলটি তুলে নেন। তিনি

এখন তার জীবনের প্রথম এবং সম্ভবতঃ শেষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাটি করবেন। তার হাতে কাঁচের এম্পুলটি কোনভাবে ভেঙ্গে গেলে এই তরল পদার্থটি বাতাসে মিশে গিয়ে আগামী চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে পৃথিবীর প্রতিটি জীবিত প্রাণীকে মেরে ফেলবে। মাত্র তিন ধরনের ভাইরাস এই বোনাসিয়াস থেকে রক্ষা পেতে পারে কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনো সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ নন। কিম জিবান হেটে ঘরের মাঝখানে আসেন, তার হাত তখনো অল্প অল্প কাঁপছে তিনি ভাল করে এম্পুলটি ধরে রাখতে পারছেন না। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের প্রাণ তিনি এখন হাতে ধরে রেখেছেন, কিম জিবান অবাক হয়ে ভাবলেন, এত বড় ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ কি কখনো অর্জন করেছিল?

* * *

নীষ কিম জিবানের ঘরে ঢুকে আবিষ্কার করেন ঘরটি অন্ধকার। বাতি জ্বালানোর চেষ্টা করতেই অন্ধকারে এক কোণা থেকে জিবান বললেন, নীষ, বাতি জ্বালিও না। একটু পরেই দেখবে চোখ অন্ধকারে সয়ে যাবে।

বাজে কথা বল না, নীষ বাতি জ্বালালেন, আমার অন্ধকার ভাল লাগে না।

জিবান চোখ কুচকে নীষের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তার মুখে আশ্চর্য একটা হাসি। নীষ বেশী অবাক হলেন না। কিম জিবান বরাবরই খেয়ালী মানুষ, এরকম একজন খেয়ালী মানুষকে সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য করা হয়েছে সেটাই আশ্চর্য। নীষ বললেন, কি ব্যাপার জিবান, আমাকে ডেকেছ কেন?

জিবান কথা না বলে ঘরের কোণায় তার ছোট ল্যাবরেটরী দেখালেন, নীষ বিস্মিত হয়ে সেদিকে এগিয়ে যান, কি ব্যাপার জিবান, তুমি ডিস্টিলেশান কমপ্লেক্স দিয়ে কি করছ?

জিবান মাথা দুলিয়ে হেসে বললেন, তুমি পৃথিবীর প্রথম পাঁচজন ব্যবহারিক পদার্থ বিজ্ঞানীদের একজন—

কথাটি সত্যি, তাই নীষ প্রতিবাদ না করে পরের অংশটুকু শোনার জন্যে অপেক্ষা করে রইলেন। জিবান বললেন, তুমিই বল আমি কি করছিলাম।

নীষ মিনিট দুয়েক ডিস্টিলেশান কমপ্লেক্সের দিকে তাকিয়ে থাকেন, কম্পিউটারের মনিটরে বার দুয়েক টোকা দিয়ে হঠাৎ বিদ্যুতস্পৃষ্টের মত চমকে উঠলেন, যখন তিনি ঘুরে জিবানের দিকে তাকিয়েছেন তার মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে। নীষ কথা বলতে পারছিলেন না, বার কয়েক চেষ্টা করে কোনভাবে বললেন, তুমি-তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ! তুমি কাঁচের এম্পুলে লিটুমিনু বোনাসিয়াস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ!

জিবান পকেট হাতড়ে এম্পুলটি বের করে তাকে দেখালেন। আতঙ্কে নীষের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, মনে হতে থাকে তার হৃদস্পন্দন থেমে যাবে, এই কাঁচের

এম্পুলটি কোনভাবে ভেঙে গেলে চব্বিশ ঘন্টার মাঝে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ শেষ হয়ে যাবে। জিবান তখনো হাসি মুখে নীষের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, আস্তে আস্তে তার হাসি আরো বিস্তৃত হয়ে উঠে, তিনি হঠাৎ অবহেলার ভঙ্গীতে এম্পুলটি নীষের দিকে ছুঁড়ে দেন।

নীষ পাগলের মত লাফ দিয়ে এম্পুলটি ধরার চেষ্টা করলেন হাত ফসকে সেটি পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেটি ধরে ফেলেছেন। হাতের মুঠোয় রেখে তিনি বিস্ফোরিত চোখে এম্পুলটির দিকে তাকিয়ে থাকেন, তার সমস্ত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। নীষ ধীরে ধীরে জিবানের মুখের দিকে তাকালেন।

জিবানের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, এম্পুলটি ফিরিয়ে দাও।

না।

জিবান ড্রয়ার খুলে ভিতর থেকে একটা বেটপ রিভলবার বের করলেন, আমাকে ফিরিয়ে দিলে এম্পুলটি রক্ষা পাবার সম্ভাবনা বেশী, তোমাকে গুলী করলে এম্পুলটি হাত থেকে পড়ে ভেঙে যেতে পারে।

জিবান! তুমি—

এম্পুলটি ফিরিয়ে দাও।

নীষ কাঁপা কাঁপা হাতে এম্পুলটি ফিরিয়ে দিলেন। জিবান এম্পুলটি টেবিলের উপর রেখে নীষ কিছু বোঝার আগে ট্রিগার টেনে সেটিকে গুলী করে বসেছেন।

প্রচন্ড শব্দ হল ঘরে, কাঁচের এম্পুলটি ছিটকে গিয়ে দেয়ালে আঘাত খেয়ে মেঝেতে এসে পড়ে এক কোণায় গড়িয়ে যায়। নীষ বিস্মিত হয়ে দেখেন এম্পুলটি ভাঙেনি, সেটির গায়ে একটু দাগ পর্যন্ত নেই। তিনি ঘুরে জিবানের দিকে তাকান, জিবানের মুখে আবার সেই ছেলেমানুষী হাসি ফিরে এসেছে। বেটপ রিভলবারটি ড্রয়ারে রাখতে রাখতে বললেন, তোমাকে ভয় দেখানোর জন্যে দুঃখিত নীষ, কেন জানি একটু মজা করার ইচ্ছা হল! এটি আমার একশ উনিশ নম্বর গুলী, আমি এটাকে গত ছত্রিশ ঘন্টা থেকে ভাঙার চেষ্টা করছি।

নীষ কোনমতে একটা চেয়ার ধরে বসে পড়েন। খানিক্ষণ অপেক্ষা করে বলেন, তুমি বলতে চাও এটি সাধারণ কাঁচ, অথচ—

হ্যাঁ, যেই মুহূর্তে এর ভিতরে বোনাসিয়াস ঢুকানো হয়েছে এটা আর ভাঙা যাচ্ছে না। একটু থেমে যোগ করলেন, কেউ একজন পৃথিবীর মানুষকে মরতে দিতে চায় না।

নীষ কাঁপা কাঁপা হাতে এম্পুলটা তুলে সেটির দিকে তাকিয়ে থাকেন, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, জিবান।

বল।

তুমি কিভাবে জানলে এরকম হবে?

জানতাম না, তাইতো পরীক্ষাটা করতে হল।

যদি তোমার অনুমান ভুল হতো, যদি

হয়নি তো।

যদি হতো? যদি—

আহ! ছেলেমানুষী করা ছাড়, জিবান হাত নেড়ে নীষকে থামিয়ে দেন। নীষ সাবধানে কাঁচের এম্পুলটিকে টোকা দিয়ে বললেন, তুমি সন্দেহ করলে কেমন করে এরকম হতে পারে।

আমার সৌর তেজস্ক্রীয়তার উপরে প্রবন্ধটার কথা মনে আছে।

যেটা পরে ভুল প্রমাণিত হল? তুমি যে পরিমাণ সৌর তেজস্ক্রীয়তা দাবি করে সেটি সত্যি হলে পৃথিবী গত শতাব্দীতে ধ্বংস হয়ে যেতো—

হ্যাঁ। কিন্তু আমার হিসেবে কোন ভুল ছিল না, আমি এখনো আমার কোন গবেষণায় কোন ভুল করিনি।

তাহলে?

আমি খুঁজে বের করেছি, একটা আশ্চর্য উপায়ে মহাজাগতিক মেঘ এসে সময়মত তেজস্ক্রীয়তাটুকু শুষে নিয়েছিল, কিভাবে সেটা সম্ভব হল কেউ জানে না। তখন আমার প্রথম সন্দেহ হয় যে কোন একজন বা কোন দল আমাদের উপর চোখ রাখছে।

এ ধরণের আরো ঘটনা আছে?

অসংখ্য! আমি মূল কম্পিউটার দিয়ে গত তিনশ বছরের "প্রায় ধ্বংস" ঘটনাগুলি দেখছিলাম। উনিশ শ সাতানব্বই সালে পৃথিবীর দুটি বড় বড় নির্বোধ দেশ একজন আরেকজনকে ধ্বংস করার জন্যে পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। কোন একটি অজ্ঞাত কারণে একটি মিসাইলও মাটি ছেড়ে উপরে উঠেনি।

আশ্চর্য!

হ্যাঁ, এক বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে "গ্রীন হাউস এফেক্ট" এর জন্যে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমস্ত পৃথিবী ডুবে যাবার কথা ছিল। কোন এক অজ্ঞাত কারণে সে সময়ে হঠাৎ করে পৃথিবীর সমস্ত সবুজ গাছপালা সালোক সংশ্লেষণে দ্বিগুণ পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করা শুরু করায় পৃথিবী রক্ষা পেয়েছে।

নীষ মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ আমি এটা জানতাম।

তুমি নিশ্চয়ই কিনিকা ধূমকেতুর কথা পড়েছ? সেটি পৃথিবীকে আঘাত করে কক্ষচ্যুত করে ফেলার মত বড় ছিল। কিন্তু ইউরেনাসের কাছে এক আশ্চর্য কারণে সেটি বিস্ফোরিত হয়ে গতি পথ পরিবর্তন করেছিল গত শতাব্দীতে সারা পৃথিবীতে একটা আশ্চর্য রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়, এতে মানুষের রোগের বিরুদ্ধে

প্রতিরোধ ক্ষমতা শেষ হয়ে যেতো। রোগটি ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিজে থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

আশ্চর্য!

হ্যাঁ, এ রকম অসংখ্য আশ্চর্য ঘটনা আছে, মূল কম্পিউটার সেগুলি খুঁজে বের করছে। তুমি দেখতে চাইলে দেখতে পার। জিবান হাত দিয়ে মনিটরকে স্পর্শ করা মাত্র কম্পিউটারটি দেয়ালে ঘটনাগুলি লিখতে লিখতে হালকা স্বরে পড়তে থাকে। জিবান বললেন, সবগুলি শুনতে চাইলে ঘন্টা তিনেক সময় লাগবে, সব মিলিয়ে একশ প্রায় ছয়শ ঘটনা আছে।

নীষ মিনিট দশেক দেখেই কম্পিউটারটিকে থামিয়ে দিলেন। তার দুহাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এসেছে। তিনি জিবানের দিকে তাকিয়ে বললেন, তার মানে তুমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলে?

হ্যাঁ। এই কাঁচের এপ্যুলটা ভাঙার চেষ্টা করে এখন পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়েছি। এখন আমি জানি এবং তুমিও জান কেউ একজন আমাদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

তার মানে—

তার মানে আমরা একটা ল্যাবরেটরীর ছোট ছোট গিনিপিগ। আমাদের দিয়ে কেউ একজন একটা পরীক্ষা করছে। যে বা যারা পরীক্ষাটা করছে তারা লক্ষ্য রাখছে নির্বোধ গিনিপিগগুলি যেন কোনভাবে মারা না যায়।

নীষের নিজেকে একটা নির্বোধ মনে হল, তবু তিনি প্রশ্নটা না করে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি পরীক্ষা করছি?

জিবান আবার হাসলেন, বললেন আমরা কোন পরীক্ষা করছি না, আমাদের দিয়ে পরীক্ষা করানো হচ্ছে।

সেটি কি?

আমি এখনো নিশ্চিত জানি না সেটি কি। এই মুহূর্তে মূল কম্পিউটার সেটি বের করার চেষ্টা করছে। পৃথিবীতে মানুষের যত অবদান সবগুলিকে নিয়ে সে একটা সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করছে। লক্ষ্য করছে তার ভিতরে কোন লুকানো সাদৃশ্য আছে কিনা, কোনভাবে সেগুলি অদৃশ্য কোন শক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিনা। অসংখ্য রাশিমালা নিয়ে অনেক জটিল হিসেব করতে হচ্ছে বলে কম্পিউটারের এত সময় লাগছে। কাল ভোরের আগে উত্তর বের করার কথা, কিন্তু আমি মোটামুটি জানি উত্তর কি হবে। তুমিও নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছ।

হ্যাঁ। নীষ মাথা নাড়লেন, জ্ঞান সাধনা।

ঠিক বলেছ। মানব জাতির ইতিহাস হচ্ছে তার জ্ঞান সাধনার ইতিহাস অথচ কি লজ্জার কথা, সেটি আসলে অন্য কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর কাজ।

নীষ হঠাৎ মাথা তুলে বললেন, আমাকে তুমি এটা জানিয়েছ কেন? নিজের অজ্ঞাতেই তার কণ্ঠে ক্ষোভ ফুটে উঠে।

আমি ছাড়াও আরো কেউ এটা জানুক।

কেন?

আমার যদি কোন কারণে মৃত্যু হয়, অন্তত আরেকজন মানুষ এটা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারবে।

নীষ উঠে দাঁড়ালেন, আমাকে একা বসে খানিক্ষণ ভাবতে হবে। আমি যাই।

যাও।

নীষ দরজার কাছে থেকে ঘুরে এসে জিবানকে বললেন, এই অদৃশ্য শক্তি, যারা আমাদের ব্যবহার করছে তারা তোমাকে মেরে ফেলল না কেন? সেই মুহূর্তে তোমার মাথায় সন্দেহটুকু উঁকি দিয়েছে—

আমি নিজেও এটা নিয়ে ভেবেছি হয়তো তাদের চিন্তাধারা আর আমাদের চিন্তাধারার তুলনা করা যায় না। হয়তো আমরা যেভাবে ভাবি, আমাদের যে ধরণের যুক্তিতর্ক তাদেরটা সে রকম নয়, অন্য রকম অনেকটা যেন মানুষ আর পিপড়া। আমি যদি অনেকগুলি পিপড়াকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করি আর হঠাৎ দেখি একটা পিপড়া বোকার মত একটা কাজ করছে যেটা নিয়ে অন্য সবগুলি পিপড়া মারা যাবে আমি তখন কি করব? আমি সেই পিপড়াটাকে বোকার মত কাজ করতে দেব না। কিন্তু পিপড়াটাকে তো মেরে ফেলব না, সেটাকে ছেড়ে দেব। নির্বোধ প্রাণী, ওকে মেরে লাভ কি?

* * *

নীষ চিন্তিত মুখে বের হয়ে যাচ্ছিলেন শুনলেন জিবান ক্ষোভের সাথে বলছেন, আমার দুঃখ কেউ একজন আমাকে নির্বোধ হিসেবে জানে।

নীষ সারা রাত তার বারান্দায় আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। কিম জিবানের সাথে কথা বলার পর হঠাৎ তার সমস্ত জীবন অর্থহীন হয়ে গেছে। সারাজীবন জ্ঞানের অন্বেষণে কাটিয়েছেন, অজানাকে জানার যে অদৃশ্য তাড়না তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে সেটি কোন এক বুদ্ধিমান প্রাণীর নির্দেশ। এই সত্যটি তিনি কোনমতে মেনে নিতে পারছেন না। তার কাছে এই জীবনের আর কোন মূল্য নেই। তিনি দুই হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে বসে থাকেন।

নীষের মাথায় হঠাৎ একটি প্রশ্ন জেগে উঠে। এই যে বুদ্ধিমান প্রাণী যারা মানব জাতিকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করছে তারা ঠিক কিভাবে মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখে? নীষ আজীবন ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা করে এসেছেন, মহাজাগতিক সংঘর্ষ কেন্দ্র তার নিজের হাতে তৈরি করা, কোন জটিল পরীক্ষা করায় তার যে অচিন্তনীয় ক্ষমতা রয়েছে তার কোন তুলনা নেই। তিনি নিজেকে

সেই অদৃশ্য বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে কল্পনা করলেন, তিনি যদি মানব জাতির সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতেন তাহলে তিনি কি করতেন? ধরা যাক তিনি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটা প্রাণী, মানুষের আচার ব্যবহার চিন্তাধারা যুক্তিতর্ক সবকিছু ভিন্ন। তিনি সেটা বোঝেন না, তার পক্ষে বোঝা সম্ভব না। পিঁপড়া যে রকম কীটপতঙ্গের তুলনায় বুদ্ধিমান। কিন্তু মানুষ কখনো পিঁপড়ার সাথে ভাব বিনিময় করতে পারে না অনেকটা সেরকম। তিনি এরকম অবস্থায় মানুষের সাথে কিভাবে যোগাযোগ রাখতেন?

কেন? এতো খুবই সহজ! নীষা হঠাৎ লাফিয়ে উঠেন, মানুষের মত কাউকে পাঠানো হবে, সে মানুষের সাথে মানুষের মত থাকবে, তার ভিতর দিয়ে সব খোঁজ খবর নেয়া হবে!

নীষ উত্তেজিত হয়ে পায়চারী শুরু করেন, কে সে মানুষ, কোথায় আছে? নীষের চোখ জ্বল জ্বল করতে থাকে, নিশ্চয়ই সেই মানুষ সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে থাকবে, এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কি আছে? দশজন সদস্যের সবাইকে তিনি চিনেন, সবার সাথে ঘনিষ্ঠতা নেই, থাকা সম্ভবও নয় কিন্তু সবাইকে খুব ভাল করে চিনেন। এদের মাঝে কে হতে পারে? মহামান্য লী? অসাধারণ প্রতিভাবান গণিতবিদ রু লুকাস? জীবন বিজ্ঞানী রুথ কিংবা শান সোয়ান? নাকি জ্যোতির্বিদ পল কুম? কে হতে পারে?

কি আশ্চর্য! নীষ হঠাৎ ভাবলেন, আমি মূল কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করি না কেন? মূল কম্পিউটারে প্রত্যেকের জীবন ইতিহাস আছে। এক নজর দেখলেই বেরিয়ে পড়বে।

নীষ ছুটে বসার ঘরে গেলেন। মনিটরকে স্পর্শ করে সর্বোচ্চ বিজ্ঞান কাউন্সিলের দশজন সদস্যের জীবন ইতিহাস জানতে চাইলেন মূল কম্পিউটারের কাছে। মূল কম্পিউটার আপত্তি জানাল, এটি গোপনীয়। তিনি জানতে চাইলে তাকে তার গোপন সংখ্যা প্রবেশ করাতে হবে। নীষ ধীরে ধীরে নিজের গোপন সংখ্যা প্রবেশ করালেন। এর জন্যে তাকে জবাবদিহি করতে হবে, সেটি গ্রহণযোগ্য না হলে তাকে নিজের প্রাণ নিতে হবে, কিন্তু একবারও তার সে কথাটি মনে হল না। নীষ একজন একজন করে প্রত্যেকের জীবন ইতিহাস দেখতে থাকেন। তার নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে আসে। হাত অল্প কাঁপছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কিন্তু তিনি জানেন, আজ তিনি বের করবেন কে সেই লোক। কে সেই আশ্চর্য বুদ্ধিমান জগতের গুপ্তচর।

* * *

বিজ্ঞান কাউন্সিলের সর্বোচ্চ পরিষদের জরুরী সভা বসেছে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দশজন বিজ্ঞানী গোল টেবিল ঘিরে বসেছেন। তাদের মুখে মৃদু হাসি, তারা নীচু

স্বরে গল্প করছেন, এই মুহূর্তে তাদের সারা পৃথিবীতে টেলিভিশনে দেখানো তাই এই অভিনয়টুকুর প্রয়োজন। কিছুক্ষণের মাঝেই কোয়ার্টজের দরজা হয়ে তাদের সারা পৃথিবী থেকে আলাদা করে ফেলল। সাথে সাথে বিজ্ঞানীর হয়ে সোজা হয়ে বসলেন। সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পরিষদের সভার কোন নিয়ম মহামান্য লী সভাপতি হিসেবে এটি নিয়ন্ত্রণের মাঝে রাখার চেষ্টা করেন তিনিই সবার আগে কথা বললেন, তোমরা সবাই জান, গত ত্রিশ ঘন্টায় বি গোপন সংখ্যা প্রবেশ করানো হয়েছে।

জিবান দুবার, নীষ একবার।

আমার মনে হয়, জীববিজ্ঞানী রুথ বললেন, গোপন সংখ্যা প্রবেশ ক নিয়মটি তুলে দিতে হবে। জিবান সেটি যে জন্যে ব্যবহার করেছে—

রুথকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে জিবান বললেন,তোমরা এক সে থেমে আমাকে কথা বলতে দেবে?

রুথ আবার শান্ত স্বরে বললেন, আমার মনে হয় যখন একজন কথা ব তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আরেকজনের অপেক্ষা করা উচিত। সর্বোচ্চ বি পরিষদের সদস্য হিসেবে—

ধেত্তেরী তোমরা সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পরিষদ! জিবান টেবিলে একটি থাবা বললেন, আমার কথা আগে শেষ করতে দাও। তিনি পকেট থেকে এক কাগজ বের করে টেবিলের মাঝখানে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এখানে সব কিছু আছে, দেখতে চাইলে দেখতে পার, কিন্তু এখন খামাখা সময় নষ্ট না করে আ কথা শুন। আমি কিছুদিন থেকে সন্দেহ করছিলাম মানবজাতি আসলে এক ধর উন্নত প্রাণীর ল্যাবরেটরী পরীক্ষা। গতকাল আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি, যে পরী করে সন্দেহ মিটিয়েছি সেটি খুব সহজ, তোমরাও দেখতে পার। জিবান প থেকে লিটুমিন বোনাসিয়ানের এম্পুলটা বের করলেন, এই বিষ দিয়ে পৃথিবীর মানুষকে মেরে ফেলা সম্ভব, পাতলা একটা কাঁচের এম্পুলে আছে, টোকা লাগা ভেঙে যাবার কথা। কিন্তু এটাকে ভাঙা সম্ভব না, কেউ একজন এটাকে ভা দিখে না, তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পার। জিবান এম্পুলটা টেবিলের উপর দিলেন, সবাই রুদ্ধশ্বাসে এম্পুলটিকে লক্ষ্য করে, এম্পুলটি সত্যি ফেটে না একটি রবারের বলের মত বার কয়েক লাফিয়ে টেবিলের মাঝখানে স্থির হয়ে যা

মহামান্য লী হাত বাড়িয়ে এম্পুলটি তুলে নেন, চোখের কাছে নিয়ে সেটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে পাশে বসে থাকা শান সোয়ানের হাতে দেন। একজন এক করে সবাই এম্পুলটি দেখেন, কারো মুখে কোন কথা নেই, জিবান সবার মু দিকে একবার তাকিয়ে বললেন এই প্রাণী আমাদের ব্যবহার করছে জ্ঞান সংগ্র জন্যে। আমি নিজেও তাই সন্দেহ করেছিলাম, আজ ভোরে মূল কম্পিউটারও গবেষণা শেষ করে আমাকে এটা জানিয়েছে। তোমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তি

কম্পিউটারে আমি তার রিপোর্ট পাঠিয়েছি, ইচ্ছে হলে দেখতে পার। জিবান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমার কথা শেষ, এখন তোমাদের যা ইচ্ছে হয় কর।

সবাই অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। মহামান্য লী আস্তে আস্তে বললেন, তার মানে আমাদের এই জ্ঞান সাধনা—

বাজে কথা! সব ওদের একটা ল্যাবরেটরী পরীক্ষা। আমরা মানুষেরা যে সৃষ্টির পর থেকে শুধু জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করছি তার কারণ কেউ একজন আমাদের বলে দিয়েছে এটা কর। কি লজ্জার কথা! মানুষের আসল ব্যবহার কি কে জানে।

সবাই একসাথে কথা বলার চেষ্টা করে, নীষের গলা সবচেয়ে উপরে উঠে সবাইকে থামিয়ে দেয়। নীষ বললেন, জিবান আমাকে ব্যাপারটি বলার পর থেকে আমি বের করার চেষ্টা করছিলাম সেই উন্নত প্রাণী মানুষের সাথে কিভাবে যোগাযোগ রাখে। আপনারা চিন্তা করলে নিজেরাই বের করতে পারবেন, সবচেয়ে সহজ হয় মানুষের চেহারার একটা কিছু তৈরী করে মানুষের মাঝে ছেড়ে দিলে। যেহেতু আমাদের সর্বোচ্চ বিজ্ঞান কাউন্সিল নামে একটা সংগঠন রয়েছে, কাজেই আমার ধারণা মানুষের চেহারার সেই উন্নত প্রাণীদের গুপ্তচর এই বিজ্ঞান কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে থাকবে।

বিজ্ঞান কাউন্সিলের সদস্যরা ভয়ানক চমকে নীষের মুখের দিকে তাকালেন। মহামান্য লী বললেন, তুমি বলতে চাও—

নীষ তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমার গোপন সংখ্যা ব্যবহার করে আমি গত রাতে আপনাদের সবার জীবন ইতিহাস আপনাদের ব্যক্তিগত দিনলিপি পড়েছি, আমি সেজন্য ক্ষমা চাইছি। আমার ধারনা ছিল আমি সেখান থেকে বের করতে পারব, কারণ আমি ধরে নিয়েছিলাম যে উন্নত প্রাণীদের গুপ্তচর সে নিজে সেটি জানে। কিন্তু সেটা সত্যি নয়।

জিবান অধৈর্য হয়ে বললেন, তুমি কি শেষ পর্যন্ত বের করতে পেরেছ?

হ্যাঁ।

কে সেই লোক?

আমি।

ঘরের ভিতরে বাজ পড়লেও কেউ বুঝি এত অবাক হত না। কয়েক মুহূর্তে লাগে সবার ব্যাপারটি বুঝতে। জিবান কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তুমি কিভাবে জান তুমিই সেই লোক? হয়তো তুমি ভুল করেছ, হয়তো—

নীষ ম্লান মুখে হাসলেন, আমি নিজেও তাই আশা করছিলাম। কিন্তু আমিই আসলে সেই গুপ্তচর, আমাকে দিয়েই সেই উন্নত প্রাণী পৃথিবীর খোঁজ খবর নেয়। বিশ্বাস কর তোমরা, আমি নিজে সেটা জানতাম না। যখন জেনেছি, নিজেকে এত অপরাধী মনে হয়েছে যে আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম।

নীষ নিজের সার্ট খুলে দেখালেন, বুকে গুলীর দাগ, রক্ত শুকিয়ে আছে। বললেন, আমি আমার হৃদপিন্ডের ভিতর দিয়ে দুটি গুলি পাঠিয়েছি, কিন্তু তবু আমি মারা যাইনি। সেই উন্নত প্রাণী যতক্ষণ না চাইবে আমি মারা যেতে পারব না, আমাকে বুকে গুলী নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। নীষ আস্তে আস্তে নিজের চেয়ারে বসলেন, মাথা নীচু করে বললেন, তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও।

আস্তে আস্তে তিনি টেবিলে মুখ ঢেকে হঠাৎ ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

গ্রুণো রবোট

দুপুরের পর বড় জানালাগুলি দিয়ে রোদ এসে আমার অফিস ঘরটি আলোকিত হয়ে যায়। আমি তখন চেয়ারটা টেনে নিয়ে রোদে গিয়ে বসি বয়স হয়ে যাবার পর এ ধরণের ছোটখাট উষ্ণতার জন্যে শরীরটা কাঙ্গাল হয়ে থাকে। এখানে বসে জানালা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়াঢাকা প্রাঙ্গনটুকুর পুরোটাই চোখে পড়ে। বসে বসে ছাত্র—ছাত্রীদের হৈ চৈ দেখতে বেশ লাগে। তারুণ্যের একটা আকর্ষণ আছে, আমি সহজে চোখ ফেরাতে পারি না। হৈ চৈ চেচামেচি দেখে মাঝে মাঝেই আমার নিজের ছাত্র জীবনের কথা মনে পড়ে যায়, সমস্ত পৃথিবীটা তখন রঙ্গীন মনে হত! একজন মানুষ তার জীবনে যা কিছু পেতে পারে আমি সবই পেয়েছি কিন্তু তবু মনে হয় এর সবকিছুর বিনিময়ে ছাত্রজীবনের একটি উজ্জল অপরাহ্নও যদি কোনভাবে ফিরে পেতাম।

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বড় আউ গাছটার নীচে একটা ছোট জটলার মত। মাঝখানে দাঁড়িয়ে লানা হাত পা নেড়ে কথা বলছে, তাকে ঘিরে বেশ কিছু উত্তেজিত তরুণ-তরুণী। লানা আমার একজন ছাত্রী, সমগ্র পরিভ্রমণের সূত্রের উপর আমার সাথে কাজ করে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, রাজনীতি, সমাজসেবা এই ধরণের আনুষাঙ্গিক কার্যকলাপে যদি এত সময় ব্যয় না করত তাহলে এতদিনে তার ডিগ্রী শেষ হয়ে যাবার কথা ছিল। খুব প্রাণবন্ত মেয়ে, অন্যদের জন্যে কিছু করার জন্যে এত ব্যস্ত থাকতে আগে কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ইদানিং মাঝে মাঝে চশমা পরা এলোমেলো চুলের একটা তরুণের সাথে দেখি। সাহিত্যের ছাত্র, নাম জিশান লাও। ওর বাবাকে খুব ভাল করে চিনি কারণ ছাত্র জীবনে দুজনে রাত জেগে দীর্ঘ সময় নানা রকম অর্থহীন বিষয় নিয়ে তর্ক করেছি। ছেলেটি যদি তার বাবার হৃদয়ের এক ভগ্নাংশও কোনভাবে পেয়ে থাকে, তাহলে অত্যন্ত হৃদয়বান একটি ছেলে হবে তাতে সন্দেহ নেই। লানার সাথে সম্ভবতঃ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, নতুন ভালবাসার মত মধুর জিনিষ পৃথিবীতে কি আছে? লানা এবং জিশানকে একসাথে দেখে আমার নিজের প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়ে যায়, যখন মনে হত ভালবাসার মেয়েটির একটি চুলের জন্যে আমি সমস্ত জগৎ লিখে দিতে পারব।

আমি চোখ সরিয়ে নিজের কাজে মন দিলাম। সপ্তম মাত্রার একটা সমীকরণ নিয়ে কয়েকদিন থেকে বসে আছি। সমাধানটি মাথায় উঁকি দিয়ে দিয়েও সরে যাচ্ছে কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। যৌবনে মস্তিষ্কের যে একটা সতেজ ভাব ছিল সেটা এখন নেই, নিজেই প্রায় সময়ে অনুভব করতে পারি। হাঁটুর উপর মোটা খাতাটি রেখে পেন্সিল নিয়ে সমীকরণটি বড় বড় করে লিখে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম। সমাধানটি আবার মাথায় উঁকি দিয়ে যেতে থাকে, আমার সমগ্র একাগ্রতা জটিল সমীকরণটির সেই অস্পষ্ট সমাধানটির পিছু ছুটতে থাকে।

কতক্ষণ মোটামুটি ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলাম জানি না, লানার গলার স্বরে ঘোর ভাঙল।

স্যার, ভিতরে আসতে পারি?

আমি কিছু বলার আগেই সে ভিতরে ঢুকে এল। বরাবরই তাই করে, আমি কোন কিছু নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকলে কেউ আমাকে বিরক্ত করার সাহস পায় না, গত সপ্তাহে শহরের মেয়র আমার সাথে দেখা করতে এসে দরজার বাইরে পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে তুলনায় এই মেয়েটি যে দুঃসাহসী তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি লানার মুখের দিকে তাকালাম। তার চোখে মুখে উত্তেজনার ছাপ সবসময়েই থাকে। সতেজ গলায় বলল, স্যার, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

আমি চেষ্টা করে মুখে গাম্ভীর্যটা ধরে রাখলাম, বললাম, আশা করি কাজটা গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

তুমি জান আমার নিজের কাজ ছাড়াও আমাকে আরো অন্তত দশটা কমিটির জন্যে কাজ করতে হয়।

জানি—লানা মুখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে বলল, আমার ধারণা আপনি সেসব কমিটিতে সময় নষ্ট না করলে নিজের কাজ খুব ভালভাবে করতে পারতেন।

লানাকে দেখার আগে আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে, কেউ এভাবে আমার সাথে কথা বলতে পারে। কিন্তু লানা যে কথাটি বলেছে সেটি সত্যি, আমি নিজে সেটা খুব ভাল করে জানি। আমি মেয়েটির কাছে সেটা প্রকাশ করলাম না, গাম্ভীর্য ধরে রেখে বললাম, তুমি জান সেসব কমিটির কোন কোনটিতে রাষ্ট্রপতি এবং বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টাও আছেন?

লানা নিজের চুল খামচে ধরে বলল, আমি বিশ্বাসই করতে রাজী না যে, আপনি ঐ সব মানুষকে কোন গুরুত্ব দেন। ওদের সবগুলোকে পাগলা গারদে রাখার কথা।

আমার হাসি আটকে রাখতে অত্যন্ত কষ্ট হল। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, তোমার কাজটা কি?

আপনি জানেন গ্রুনো নামে নতুন রবোট বের হয়েছে।

শুনেছি।

ওদের কম্পেট্রনে নাকি সিস্টেম ৯ ঢোকানো হয়েছে।

সেটার মানে কি?

আপনি সিস্টেম ৯ কি জানেন না? লানা আমার অজ্ঞানতায় খুব অবাক হল এবং সেটা গোপন রাখার কোন রকম চেষ্টা করল না। বলল, গত দশ বছর থেকে সিস্টেম ৯-এর উপর কাজ হচ্ছে। এটা হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম যেটার সাথে মানুষের কোন পার্থক্য নেই।

কেউ জানে না, অত্যন্ত গোপনীয় জিনিষ। এখন সেটাকে গ্রুনো রবোটের কম্পেট্রনে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

সেটার মানে কি?

লানা উত্তেজিত মুখে বলল, তার মানে গ্রুনো রবোটের সাথে মানুষের কোন পার্থক্য নেই। দেখে কথা বলে কোনভাবেই বোঝা যাবে না কোনটা মানুষ কোনটা রবোট।

আমি ভুরু কুচকে বললাম পৃথিবীতে কি সত্যিকার মানুষের অভাব আছে যে এখন গ্রুনো রবোটকে মানুষ হিসেবে বাজারে ছাড়তে হবে?

লানা আমার কথাটি লুফে নিয়ে বলল, সেটাই তো কথা। বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা কি বলেছে শুনেন নি?

কি বলেছে?

কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে দেশের সব বিচারপতিদের অবসর করিয়ে দিয়ে সেখানে গ্রুনোরবোটদের বসানো হবে।

সত্যি?

সত্যি। লানা মুখের উপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে বলল, আজকের কাগজে উঠেছে।

বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা লোকটির সম্ভবতঃ সত্যিই মাথা খারাপ। লানার পরামর্শ শুনে কিছুদিন পাগলা গারদে আটকে রাখলে মনে হয় মন্দ হয় না। আমার সাথে লোকটির মাঝে মাঝে দেখা হয়। বলে দিতে হবে যেন এরকম বেফাঁস কথাবার্তা না বলে। দেশের অর্থনীতির একটা বড় অংশ রবোট শিল্পের উপর নির্ভরশীল, মনে হয় সেই শিল্পকে খুশী রাখার জন্যে এ ধরনের কথাবার্তা মাঝে মাঝে বলে ফেলতে হয়।

লানা গম্ভীর গলায় বলল, গ্রুনো কোম্পানীর সাহস কি পরিমাণ বেড়েছে আপনি শুনতে চান?

বল।

ওদের ফ্যাক্টরী থেকে দু'জন মানুষ পাঠিয়েছে আমাদের কাছে, তার মাঝে নাকি একজন হচ্ছে সত্যিকার মানুষ আরেকজন গ্রুনো রবোট।

কোনটা গ্রুনো রবোট?

জানি না। লানাকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল, বলল, কোনটা ওরা বলবে না, আমাদের বের করতে হবে।

কেন?

আমরা গ্রুনো রবোটকে বিচারপতি পদে বসানো নিয়ে একটা প্রতিবাদ সভা করেছিলাম, সেটা শুনে কোম্পানী এই দুইজন মানুষ পাঠিয়েছে। ওরা আমাদের কাছে প্রমাণ করতে চায় যে গ্রুনো রবোট হুবহু মানুষের মত, কোন পার্থক্য নেই। ওরা দাবী করেছে যে আমরা কিছুতেই বের করতে পারব না কোনটা মানুষ কোনটা গ্রুনো রবোট।

পেরেছ?

লানা ঠোঁট কামড়ে ধরে বলল, না।

বাজীতে হেরে গেলে?

কিন্তু স্যার, আপনি বুঝতে পারছেন আমরা যদি বের করতে না পারি তাহলে কি হবে?

কি হবে?

গ্রুনো রবোট কোম্পানী সব খবরের কাগজ, রেডিও টেলিভিশনে খবরটা প্রকাশ করে দেবে। বড় বড় করে বিজ্ঞান দেবে যে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ চব্বিশ ঘন্টা চেষ্টা করেও গ্রুনো রবোটের সাথে মানুষের পার্থক্য ধরতে পারেনি। তারপর সত্যি সত্যি বিচারকদের জায়গায় গ্রুনো রবোটকে বসানো হবে।

সমস্যার কথা, কি বল?

লানা আমার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল আমি ঠাট্টা করছি কিনা। একটু পর প্রায় মরিয়া হয়ে বলল, আপনি বের করে দেবেন?

আমি?

লানা মাথা নাড়ে, আমরা সারাদিন চেষ্টা করেছি।

পারনি?

না। লজ্জায় মেয়েটির চোখে প্রায় পানি এসে যায়। কাতর গলায় বলল, যতভাবে সম্ভব চেষ্টা করেছি, মানুষের যতরকম অনুভূতি আছে সবগুলো চেষ্টা করে দেখেছি কোন লাভ হয়নি। লানা আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বলল, আপনি বের করে দেবেন?

আমার মেয়েটির জন্যে খুব মায়া হল। বাইরে সেটা প্রকাশ না করে উদাস ভঙ্গিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললাম, যদি সত্যি বের করতে না পার তাহলে তো স্বীকার করতেই হবে গ্রুনো রবোট সত্যিই মানুষের মত।

সেটা তো স্বীকার করছিই। মানুষের মত আর মানুষ দুটি তো এক জিনিস নয়। মানুষের সত্যিকার অনুভূতি থাকবে না কিন্তু মানুষের বিচার করবে সেটা তো হতে পারে না। দেবেন বের করে?

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম, বিকেল হয়ে আসছে সন্ধ্যেবেলা একটা কনসার্টে যাবার কথা, হাতে খুব বেশী সময় নেই। কিন্তু মেয়েটি এত আশা করে এসেছে তাকে তো নিরাশ করা যায় না। লানার দিকে তাকিয়ে বললাম, ঠিক আছে ওদের নিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষা কর। আমি না ডাকা পর্যন্ত ভিতরে আসবে না।

লানার মুখ খুশীতে উজ্জল হয়ে উঠে, আমি নিশ্চিত অন্য কেউ হলে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরত। আমার মুখের গাম্ভীর্যটি দেখে সাহস করল না। দীর্ঘদিন চেষ্টা করে এই গাম্ভীর্যটি আয়ত্বে এনেছি, সহজে কেউ কাছাকাছি আসতে সাহস করে না।

লানা বের হয়ে যেতেই আমি আমার সেক্রেটারী ট্রীনাকে ডাকলাম। ট্রীনা মধ্যবয়সী হাসি খুশী মহিলা। ভিতরে ঢুকে বলল, কিছু বলবেন স্যার?

তোমার খানিক্ষণ সময় আছে?

অবশ্যই। সে আমার সামনের খালি চেয়ারটিতে বসে পড়ে বলল, কি করতে হবে?

আমি ষড়যন্ত্রীর মত গলা নামিয়ে বললাম, লানার ছেলে বন্ধু জিশানকে তুমি চেনো?

ট্রীনা বিস্ময়টুকু সযত্নে গোপন করে বলল, সেরকম চিনি না, সাথে দেখেছি দু একবার।

ওর বাবা আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। ছেলেটি যদি বাবার কাছাকাছি হয় তাহলে খুব হৃদয়বান হওয়ার কথা।

ট্রীনা মাথা নেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি গলার স্বর আরো নামি বললাম, জিশানের পুরো নাম জিশান লাও। ডাটা বেসে খোঁজ করে দেখ তো ওর সম্পর্কে কোন চোখে পড়ার মত তথ্য পাও কি না। আমার নাম ব্যবহার করে খোঁজ করো, অনেক রকমন খোঁজ পাবে তাহলে।

ট্রীনা কিছুক্ষণের মাঝেই একটা কাগজ নিয়ে ঢুকল, আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, জিশানের উপর অনেক বড় ফাইল আছে, আমি শুধু দরকারী জিনিসটা টুকে এনেছি।

আমি এক নজর দেখে বললাম, ঠিক আছে ট্রীনা, তুমি লানাকে বলবে ভিতরে আসতে? তার দুজন সঙ্গীকে নিয়ে।

লানা প্রায় সাথে সাথেই দু'জন মানুষকে নিয়ে ঢুকল। কিছু কিছু মানুষের চেহারা দেখে বয়স বোঝা যায় না, এদের দু'জনেই সেরকম। পরনে মোটামুটি ভদ্র পোশাক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মত খাপছাড়া নয়। একজন আমার দিকে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমার নাম

আমি বাধা দিয়ে বললা, তোমার নাম এক নম্বর।

এক নম্বর? লোকটি থতমত খেয়ে বলল, আমার নাম এক নম্বর?

হ্যাঁ আপাততঃ তোমার ঠিক নামটি শুনে কাজ নেই। কারণ তুমি যদি গ্রুনো রবোট হয়ে থাক তাহলে সম্ভবত মিথ্যা একটা নাম বলবে। শুধু শুধু মিথ্যাচার করে লাভ কি। তোমাকে ডাকা যাক এক নম্বর।

এক নম্বরের দুই গাল একটু লাল হয়ে উঠে। রাগ হয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে উষ্ণ স্বরে বলল, আমি গ্রুনো রবোট নই। আমাকে জোর করে পাঠিয়েছে ওর সাথে। সে দ্বিতীয় লোকটিকে দেখিয়ে বলল, ঐ হচ্ছে গ্রুনো রবোট।

দ্বিতীয় লোকটি এবারে একটু মধুর ভঙ্গীতে হাসার চেষ্টা করে বলল, আপনার কথা অনেক শুনেছি আমি। পরিচয় হয়ে খুব ভাল লাগল। অবশ্যি ঠিক পরিচয় হল না, কারণ আপনি তো নিশ্চয়ই আমার নামও শুনতে চাইবেন না।

না। আপাততঃ তোমার নাম হোক দুই নম্বর।

মানুষকে তার নিজের পরিচয় দিতে না দেয়ার মাঝে খানিকটা অপমানের ব্যাপার আছে।

এক নম্বর ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, তোমার সাথে এসেছি বলে আজ আমার এই অপমান।

আমিও তো একই কথা বলতে পারি।

না পার না, এক নম্বর চোখ লাল করে বলল, তুমি গ্রুনো।

তুমি এত নিশ্চিত হলে কেমন করে যে আমি গ্রুনো?

কারণ আমি জানি আমি গ্রুনো না আমি মানুষ।

কেমন করে জান? হতে পারে তুমি মিথ্যা বলছ। কিংবা কে জানে আরো ভয়ংকর জিনিষ হতে পারে, তুমি ভাবছ তুমি মানুষ কিন্তু আসলে তুমি গ্রুনো। তুমি নিজেই জান না যে তুমি গ্রুনো।

এক নম্বরকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল, আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, সেটা কি হতে পারে?

কোনটা?

যে আমি গ্রুনো কিন্তু আমি মানুষ না?

না। কারণ তুমি যদি গ্রুনো হয়ে থাক, তাহলে তোমার মাথায় মস্তিষ্কের বদলে রয়েছে একটা কম্পেট্রন। তোমার বুকের মাঝে আছে একটা পারমানবিক সেল। তোমার কম্পেট্রন ক্রমাগত হিসেব করছে সেলের ভোল্টেজ, ক্লক ফ্রিকোয়েন্সী আর

তোমাকে সেটা জানাচ্ছে মিলি সেকেন্ড পর পর। কাজেই তুমি যদি গ্রুনো হয়ে থাক, তাহলে তুমি মিথ্যাবাদী গ্রুনো।

এক নম্বর উষ্ণ স্বরে বলল, আমি গ্রুনো না, আমি মানুষ।

গ্রুনোকে মানুষের মত করে তৈরী করা হয়েছে, কাজেই তুমি যদি গ্রুনো হয়ে থাক তুমি মিথ্যা বলবে না আমি সেরকম আশা করছি না।

দু'নম্বর একটু এগিয়ে এসে বলল, গত সংখ্যা বিজ্ঞান সংবর্তে আপনার লেখাটা পড়ে—

তুমি কি গ্রুনো?

দু'নম্বর গতমত খেয়ে গেল। কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, আমি যতদূর জানি যে আমি গ্রুনো না। আমার অতীত জীবনের সবকিছু পরিষ্কার মনে আছে, গ্রুনো হলে নিশ্চয়ই মনে থাকত না। খুব ছেলেবেলায় দোলনা থেকে পড়ে গিয়ে একবার হাটু কেটে গেল সেটাও মনে আছে। সত্যি কথা বলতে কি কাটা দাগটা এখনো আছে। দেখবেন?

আমি কিছু বলার আগেই এক নম্বর বলল, দেখাও দেখি।

দুনম্বর প্যান্ট হাটুর উপর টেনে তুলে একটা কাটা দাগ দেখাল।

এক নম্বর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাটা দাগটা খানিক্ষণ দেখে বলল, জালিয়াতি, পুরো জালিয়াতি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ক্যামিকেল এচিং।

দুনম্বর গম্ভীর গলায় এক নম্বরকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি শৈশবের কথা মনে আছে?

অবশ্যই মনে আছে।

কত শৈশব?

অনেক শৈশব।

দু নম্বর মাথা নেড়ে বলল, কিছু আসে যায় না। আমি কোনভাবে জানতে পারব না তুমি সত্যি কথা বলছ না মিথ্যা কথা বলছ।

আমি মিথ্যা বলি না।

সেটাও কোনদিন প্রমান করা যাবে না। দুনম্বর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝলেন স্যার, আজ সারাটি দিন খুব অপমানের মাঝে কেটেছে। আমাকে দেখলেই বুঝবেন জীবিকার জন্যে মানুষকে কিনা করতে হয়। আমার সম্পর্কে এক চাচার কাজ ছিল একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গলদা চিংড়ি সেজে দাঁড়িয়ে থাকা। কি অপমান।

লানা আমার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, স্যার কিছু বুঝতে পারলেন? আমার মনে হয় দু নম্বর, কি বলেন?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, এখনো জানি না।

তাহলে?

তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

কি কাজ?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, তুমি তোমার অফিসে গিয়ে বস। আমি এখান থেকে দুজনকে পাঠাব। তুমি তাদের সাথে হালকা কোন জিনিস নিয়ে কথা বলবে। হালিস কোন গল্প। বেশীক্ষণ নয়, ঘড়ি ধরে দুই মিনিট।

ঠিক আছে।

আর শোন, ঘরের বাতিগুলো কমিয়ে দেবে, যেন তোমাকে ভাল করে দেখতে না পারে।

বেশ।

ওদের বসাবে, তোমার খুব কাছাকাছি। একটা টেবিলে এপাশে আর ওপাশে।

ঠিক আছে স্যার।

লানা চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে ফেললাম। হঠাৎ মনে পড়েছে এরকম ভঙ্গি করে বললাম, তুমি তো রাজনীতি সমাজনীতি এরকম অনেক কাজকর্ম কর, কয়দিন থেকে ভাবছি তোমাকে একটা জিনিস বলব।

কি জিনিস?

পরে বলব, আমাকে মনে করিয়ে দিও।

দেব স্যার।

আর এই কাগজটা রাখ, কাউকে দেখাবে না। কয়দিন থেকে তোমাকে দেব ভাবছি মনে থাকে না।

লানা কাগজটি নিয়ে বের হয়ে প্রায় সাথে সাথে ফিরে এল। আমি জানতাম আসবে, কারণ এখানে যে দুজনের নাম লেখা হচ্ছে তার একজন হচ্ছে নিশাল লাও। শুধু তাই নয় উপরে লেখা আছে 'পুলিশের গুপ্তচর'। লানা পাংশু মুখে জিজ্ঞেস করল, এখানে কাদের নাম?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, তোমরা যারা রাজনীতি কর তাদের পিছনে সরকার থেকে গুপ্তচর লাগানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার ভান করে এরা তোমাদের ভিতর থেকে খবর বের করার চেষ্টা করবে। পুলিশের টিকটিকি। এদের থেকে সাবধান।

লানার মুখ মুহূর্তে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে যায়। কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মুখ ঘুরিয়ে মাথা নীচু করে হেঁটে চলে যেতে থাকে। এরকম প্রাণবন্ত একটি মেয়েকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখা খুব কষ্টকর। কিন্তু। আমার কিছু করার ছিল না।

আমি খানিক্ষণ অপেক্ষা করে একনম্বর এবং দুনম্বরকে বললাম, তোমরা দুজন এখন করিডোরের শেষ ঘরটিতে যাবে। সেখানে লানা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা

করে আছে। সে তোমাদের সাথে কিছু একটা কথা বলবে, সেটা শুনে আমার কাছে এস। ঠিক আছে?

দু'জনে মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

যাও।

দু'জনেই বের হয়ে গেল। পাঁচ মিনিটের মাথেই দু'জনে ফিরে এল। দুজনেরই হাসি হাসি মুখ এক নম্বরের মনে হল একটু বেশী হাসি মুখ।

জিজ্ঞেস করলাম, লানার সাথে কথা হল?

হ্যাঁ, হয়েছে। এক নম্বর দাঁত বের করে হেসে বলল, মেয়েটার যাকে বলে একেবারে তীক্ষ্ণ রসিকতাবোধ। এমন হাসির একটা গল্প বলেছে কি বলব। একজন লোক টুথব্রাশ বিক্রি করে। দেখা গেল তার মত আর কেউ—

দুনম্বর বাধা দিয়ে বলল, আমার মনে হয় না স্যার এখন তোমার মুখ থেকে গল্পটা শুনতে চাইছেন।

না, আমি মানে এক নম্বর আমতা আমতা করে থেমে গেল। আমি টেবিলের উপর থেকে দরকারী কিছু কাগজপত্র আমার হাত ব্যাগে ঢুকাতে ঢুকাতে বললাম, লানার মনে অবস্থা কেমন দেখলে?

মনের অবস্থা?

হ্যাঁ। মনের অবস্থা কেমন?

এক নম্বর একটু অবাক হয়ে বলল, মনের অবস্থা আবার কেমন হবে? ভাল। এত হাসির একটা গল্প বলল—এক নম্বর আবার দাঁত বের করে হাসা শুরু করে।

দুনম্বর মাথা নেড়ে বলল, সত্যি কথা বলতে কি স্যার, আপনি যখন জিজ্ঞেস করলেন আমি বলি, আমার কেন জানি মনে হল মেয়েটার মন খারাপ।

মন খারাপ এক নম্বর অবাক হয়ে বলল, মন খারাপ হবে কেন? কি দেখে তোমার মনে হল মন খারাপ?

দুনম্বর মাথা চুলকে বলল, ঠিক জানি না। কিন্তু মনে হল—

এক নম্বর বাধা দিয়ে বলল, অন্ধকারে বসেছিল ভাল করে দেখা পর্যন্ত যাচ্ছিল না, আর তোমার মনে হল খারাপ?

দুনম্বর একটু থতমত খেয়ে বলল, ইয়ে ঠিক জানি না কেন মনে হল। আমি অবশ্যি একেবারে নিশ্চিত না। হতে পারে ভুল মনে হয়েছে।

আমি দুনম্বরের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, না, তোমার ভুল মনে হয়নি, তুমি ঠিকই ধরেছ। লানার আসলেই মন খারাপ।

এক নম্বরের মুখ হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, আমার দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকাল সে। আমি আস্তে আস্তে বললাম, এক নম্বর, তুমি একজন গ্রুনো।

আ—আমি আমি?

হ্যাঁ তুমি। তাই তুমি ধরতে পারনি লানার মন খারাপ। একজন মানুষের যদি খুব মন খারাপ হয়, তার সাথে কোন কথা না বলেই তার আশেপাশে এলেই সেটা ধরে ফেলা যায়। এটা পরীক্ষিত সত্য। মানুষেরা ধরতে পারে। যন্ত্র পারেনা।

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে এক নম্বরের ডান কানের নীচে হাত দিয়ে সুইচটা খুঁজে বের করে তার সার্কিট কেটে দিলাম। দেখতে দেখতে তার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেল মুখ দিয়ে অর্থহীন শব্দ করতে করতে এক নম্বর স্থির হয়ে গেল। শরীরে আর কোন প্রাণের চিহ্ননেই।

আমি দুনম্বরকে বললাম, জিনিসটাকে নীচে শুইয়ে রাখ। হঠাৎ করে কারো উপর পড়ে গিয়ে একটা ঝামেলা করবে।

দু'নম্বর বিস্ফোরিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমতা আমতাভাবে বলল, কেমন করে শোওয়াব?

আমি এগিয়ে গিয়ে বুকে একটা হোট ধাক্কা দিয়ে বললাম, এভাবে।

গ্রুনো রবোটটি প্রচন্ড শব্দ করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল। এক নম্বর দীর্ঘদিনের অভ্যাসের কারণে তাকে একবার ধরার চেষ্টা করল কিন্তু কোন লাভ হল না। রবোটটি ভাল তৈরী করেছে, এভাবে আছড়ে পড়েও শরীরের কোন অংশ ভেঙ্গে আলাদা হয়ে গেল না।

আমি টেবিল থেকে আমার ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে বাসায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। দুই নম্বর কোনভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আপনাকে যে আমি কি বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না। বিশ্বাস করেন নিজের উপর সন্দেহ এসে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমি কি সত্যিই মানুষ?

অবশ্যি তুমি মানুষ। তোমার সাথে পরিচয় হয়ে খুব ভাল লাগল। আমি আন্তরিকভাবে তার সাথে হাত মিলিয়ে বললাম, এখন তোমার নামটা আমি শুনতে পারি।

মিকালো—আমার নাম শিন মিকালো।

শিন মিকালো, তোমার সাথে পরিচয় হয়ে খুব ভাল লাগল।

ঠিক এ সময় লানা দরজায় এসে দাঁড়ায়। মিকালো তাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠে উচ্চস্বরে বলল, স্যার বের করে ফেলেছেন গ্রুনোকে।

লানা মেঝেতে পড়ে থাকা গ্রুনোকে এক নজর দেখে বলল, কেমন করে বের করলেন?

সহজ, একেবারে সহজ। মিকালো এক হাতের উপর অন্য হাত দিয়ে তালি দিয়ে বলল, একেবারে পানির মত সহজ। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, লানার মনের অবস্থা কেমন? আমি বললাম মন খারাপ গ্রুনো বলল, না—

লানা চমকে উঠে আমার দিকে তাকায়। আমি কথোপকথনটি না শোনার ভান করে বললাম, লানা, তোমাকে একটা কাগজ দিয়েছিলাম খানিক্ষণ আগে?

লানা শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, কেন? কি হয়েছে?

তোমাকে ভুল কাগজটা দিয়েছি। আমি তাকে আরেকটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললাম, এটা হচ্ছে সেই কাগজ। আগেরটা ফেলে দিও।

আগেরটা ভুল?

হ্যাঁ, ভুল।

এটা ঠিক?

হ্যাঁ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে আমার এক ছাত্র কাজ করে, সে মাঝে মাঝে এসব গোপন খবর দিয়ে যায়।

লানা এক নজর কাগজটা দেখে বলল, তাহলে আগে যে কাগজটা দিয়েছিলেন সেটা কি?

ওটা—ওটা অন্য জিনিস।

কি জিনিস?

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েকজন ছাত্র—ছাত্রীর কিছু মৌলিক লেখা বই হিসেবে বের করবে, তাদের নাম। আমার এক বন্ধুর ছেলের নামও আছে, জিশান লাও। খুব ভাল ছেলে—

লানার মুখ থেকে গাঢ় বিষাদের ছায়া সরে গিয়ে সেখানে সচ্ছ একটা আনন্দের হাসি ঝলমল করে উঠে। আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বলল, আপনি ইচ্ছে করে আমাকে ভুল কাগজটা দিয়েছিলেন। ইচ্ছে করে! তাই না?

আমি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললাম, গ্রুনো কোম্পানী কি তাদের রবোটটা নিয়ে তোমাদের সাথে কোন রকম চুক্তি সই করেছে?

না।

কোন রকম চুক্তি সই করেনি?

না। কিছু না।

তাহলে একটা কাজ কর। ওটার কপোট্রনটা খুলে সিস্টেমটা বের করে নাও। সেটা কপি করে তোমাদের বন্ধু বান্ধব পরিচিত মানুষজনকে বিলিয়ে দিও। ঘরে ঘরে সবার কাছে যদি একটা করে সিস্টেম ৯ এর কপি থাকে তাহলে গ্রুনো কোম্পানীকে পুরো সিরিজটা বাতিল করে দিতে হবে। ভবিষ্যতে আর এ ধরনের মামদোবাজী করবে না।

কপোট্রন কেমন করে খুলে?

স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে কপালের মাঝে জোরে আড়াআড়িভাবে চাপ দাও, খুলে যাবে। দাঁড়াও আমি খুলে দিচ্ছি।

আমি একটা স্ক্রু ড্রাইভার বের করে কপালে চাপ দিয়ে রবোটটার মাথাটা খুলে আনলাম।

গ্রুনো রবোটটি মাথা খোলা অবস্থায় ঘোলাটে চোখে বিসদৃশ ভঙ্গিতে মেঝের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে রইল।

অনিশ্চিত জগৎ

ঘুম থেকে উঠে খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকেন বৃদ্ধ রাউথ। কয়দিন থেকে তার একটা আশ্চর্য অনুভূতি হচ্ছে। সব সময়েই মনে হয় কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে। এত বাস্তব অনুভূতি যে রাউথ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে চারিদিক না দেখে পারলেন না।

কি দেখছেন প্রফেসর রাউথ?

প্রফেসর রাউথের ছোট কম্পিউটারটি মিষ্টি স্বরে তাকে জিজ্ঞেস করল, কয়দিন থেকে দেখছি আপনি হঠাৎ হঠাৎ করে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক সেদিক দেখছেন। কি দেখছেন?

নাহ, কিছু না।

বলুন না কি হয়েছে। কম্পিউটারটি অনুযোগের সুরে বলল, আপনিতো আমার কাছে কখনো কিছু গোপন করেন না।

বৃদ্ধ রাউথ মাথা চুলকে বললেন, ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাতে পারলে বলতাম, কিন্তু তুমি ঠিক বুঝবে না। জিনিসটা নেহায়েৎ মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। মানুষ লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তনের ফল, তাদের রক্তে কিছু কিছু আশ্চর্য জিনিস রয়ে গেছে যার জন্যে মাঝে মাঝে তারা এমনকিছু অনুভব করে যার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।

যেমন?

যেমন—প্রফেসর রাউথ একটু ইস্ততঃ করে বলেই ফেললেন, যেমন কয়দিন থেকে মনে হচ্ছে সব সময় আমার দিকে যেন কেউ তাকিয়ে আছে।

প্রফেসর রাউথের কম্পিউটারটি যাকে তিনি সখ করে ট্রিনিটি বলে ডাকেন খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আশ্চর্য।

হ্যাঁ, আশ্চর্য।

ভারী আশ্চর্য।

হ্যাঁ, কিন্তু এটা নিয়ে তোমার ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই। আমরা মানুষেরা অনেক ধরনের পরস্পর বিরোধী জটিল জিনিস নিয়ে বেঁচে থাকি।

তা ঠিক।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা আসলে তত খারাপ নয়—তুমি যত খারাপ মনে কর তত খারাপ নয়। যাই হোক, নতুন কোন খবর আছে?

ট্রিনিটি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, তেমন কিছু নয়।

প্রফেসর রাউথ হাসার চেষ্টা করে বললেন, তার মানে খারাপ খবর। কি হয়েছে বলে ফেল।

আপনার মাসিক ভাতা কর্মিয়ে অর্ধেক করে দেয়া হয়েছে।

প্রফেসর রাউথ ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি প্রথম সারির গণিতবিদ, তিনি ইচ্ছে করলে তার নামে পৃথিবীতে দুটি ইন্সটিটিউট থাকত, প্রতি পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা চমকপ্রদ সমীকরণটি তার চিন্তা প্রসূত, তার সহকর্মী সেটিকে নিজের বলে ঘোষণা করে সবকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। অথচ তিনি অর্থাভাবে শহরের পুরাতন ঘিঞ্জি এলাকার ছোট একটা ঘর ভাড়া করে দুঃস্থ শ্রমিকদের মত ক্রেটিনাত খাবার খেয়ে বেঁচে থাকেন। তার সেরকম কোন বন্ধু নেই, স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে নিঃসঙ্গ। ট্রিনিটির সাহচার্যের বাইরে তার কোন জগৎ নেই। তার প্রয়োজন অতি অল্প অথচ সেখানেও আবার হাত বসানো হল।

প্রফেসর রাউথ।

বল

আপনি গ্যালাক্টিক হাইপার ড্রাইভের উপর কাজটা করতে রাজী হয়ে যান।

প্রফেসর রাউথ মাথা নেড়ে বললেন, তা হয় না ট্রিনিটি। নিজের সখের কাজ করি বলে মনে হয় বেঁচে থাকা কত আনন্দের। যদি যুদ্ধ কৌশলের উপর কাজ করি তাহলে কি কখনো মনে হবে বেঁচে থাকা আনন্দের?

কিন্তু অন্য অনেকে তো করছে।

করুক। যদি সবাইও করে তবু আমি করব না। জীবন বড় ছোট, সেটা নিয়ে ছেলে খেলা করতে হয় না।

ট্রিনিটি প্রফেসর রাউথের প্রাতঃকালীন খাবারের আয়োজন করতে বের হয়ে গেল। প্রফেসর রাউথ চুপচাপ বিছানায় বসে রইলেন, তার আবার মনে হতে থাকে কেউ একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি মাথা ঘুরিয়ে তাকান, খুটিয়ে খুটিয়ে চারিদিকে দেখেন। কেউ নেই, কিন্তু কি আশ্চর্য তার তবু মনে হতে থাকে কেউ একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি মাথা ঘুরিয়ে তাকান, খুটিয়ে খুটিয়ে চারিদিকে দেখেন। কেউ নেই, কিন্তু কি আশ্চর্য তার তবু মনে হতে থাকে কেউ একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে, বিষণ্ণ দৃষ্টি কাতর মুখ। কিছু একটা বলতে চায় মিনতি করে। মন খারাপ হয়ে যায় প্রফেসর রাউথের।

একটু বেলা হয়ে এলে প্রফেসর রাউথ কাজ করতে বসেন। অভ্যেসমত প্রথম ঘন্টা দুয়েক পড়াশোনা করে নেন। পৃথিবীর যাবতীয় গাণিতিক জার্নালের সারাংশ

তার কাছে পাঠানো হয়। এটি খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার, দুঃসহ অর্থাভাবের মাঝেও তিনি সেটা বন্ধ করেননি। নূতন নতুন আজকর্ম কি হচ্ছে তার উপর চোখ বুলিয়ে নিজের পছন্দসই বিষয়গুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন। প্রতিভাবান নতুন কোন গণিতবিদ বের হয়—কিনা তিনি লক্ষ রাখেন। কমবয়সী ক্ষ্যাপা গোছের একজন গণিতবিদ হঠাৎ করে গণিতের জগতে একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেবে এ ধরনের একটা ছেলেমানুষী চিন্তা প্রায় তার মাথায় খেলা করে।

প্রতি জগতের উপর প্রফেসর রাউথ অনেকদিন থেকে কাজ করছেন, সমস্যাটি জটিল এবং প্রতিবার তিনি এক জায়গায় এসে আটকে যাচ্ছেন। যে ব্যাপারটি নিয়ে সমস্যা সেটি একটি ছোট গাণিতিক সমস্যা যার কোন সমাধান নেই বলে বিশ্বাস করা হয়। এরকম পরিবেশে সাধারণতঃ সমস্যাটা এড়িয়ে একটি সমাধান ধরে নিয়ে কাজ শেষ করা হয়। প্রফেসর রাউথ খাঁটি গণিতবিদ তিনি কোন কিছু এড়িয়ে যাওয়া পছন্দ করেন না, তাই গত পনেরো বছর থেকে তিনি এই ছোট, গুরুত্বহীন কিন্তু প্রায় অসম্ভব সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তার বর্তমান অর্থাভাবের সেটি একটি বড় কারণ।

প্রফেসর রাউথ কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। সমীকরণটি প্রায় কয়েক হাজার বার নানাভাবে লিখেছেন, আজকেও গোটা গোটা হাতে লিখলেন। নিরীহ এই সমীকরণটি যে কত ভয়ঙ্কর জটিল হতে পারে কে বলবে? প্রফেসর রাউথ সমীকরণটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, হঠাৎ তার মনে হল আজ হয়তো তার সমাধান বের করে ফেলবেন। কেন এরকম মনে হল তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না।

গত কয়েকদিন থেকে তার মাথায় একটা নতুন জিনিস খেলছে, সেটা আজ ব্যবহার করে দেখলেন। ঠিক কিভাবে ব্যবহার করবেন এখনো জানেন না। নানারকম সম্ভাবনা রয়েছে সবগুলো চেষ্টা করে দেখতে একটা জীবন পার হয়ে যেতে পারে—তাই খুব ভেবে চিন্তে অগ্রসর হতে হবে। প্রফেসর রাউথ অন্যমনস্কভাবে কলমটি ধরে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়লেন।

ট্রিনিটি দুপুর বেলা প্রফেসর রাউথকে এক গ্লাস দুধ দিয়ে গেল। বিকেলে এসে দেখল তিনি সেই দুধ স্পর্শও করেননি। প্রফেসর রাউথ ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করতে পারেন না, তার জন্যে সারাদিন অভুক্ত থাকা একটা গুরুতর ব্যাপার। ট্রিনিটি তাকে বিরক্ত করল না, কম্পিউটারের স্বল্প বুদ্ধিতে এই বৃদ্ধ লোকটিকে পুরোপুরি অনুভব করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে, এরকম অবস্থায় প্রফেসর রাউথকে একা একা কাজ করতে দিতে হয়।

প্রফেসর রাউথ যখন তার টেবিল ছেড়ে উঠলেন তখন গভীর রাত, প্রচন্ড ক্ষুধায় তার হাত কাঁপছে। কিন্তু তার মাথা আশ্চর্য রকম হালকা। তিনি বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে ঠান্ডা পানি দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ট্রিনিটি হালকা স্বরে ডাকল, প্রফেসর রাউথ।

বল।

আপনি সত্যি তাহলে সমাধান করেছেন?

হ্যাঁ ট্রিনিটি।

আমার অভিনন্দন প্রফেসর রাউথ।

অনেক ধন্যবাদ।

আমি জানতাম আপনি এটা সমাধান করতে পারবেন।

কেমন করে জানতে?

কারণ আপনি হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ।

প্রফেসর রাউথ শব্দ করে হাসলেন। ট্রিনিটি বলল, এটি করতে আপনার সবচেয়ে বেশী সময় লেগেছে।

জানি।

সমস্যাটি কি সত্যিই এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

যে জিনিস আমরা জানি না সেটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না, সে হিসেবে এটার কোন গুরুত্ব ছিল না কিন্তু এখন এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সত্যি?

হ্যাঁ।

আপনি নতুন কিছু শিখলেন প্রফেসর রাউথ?

শিখেছি।

কি?

বললে তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না।

করব আপনি বলুন, আমি আপনার সব কথা বিশ্বাস করি।

শুন তাহলে, না বুঝলে প্রশ্ন করবে।

করব।

প্রফেসর রাউথ ট্রিনিটিকে বোঝাতে চেষ্টা করেন।

আমাদের পরিচিত জগৎ হচ্ছে ত্রিমাত্রিক জগৎ সময়টাকে চতুর্থ মাত্রা হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু সত্যিই কি আমাদের জগৎ চার মাত্রার? এমন কি হতে পারে যে জগৎটি আটমাত্রার এবং আমরা শুধু মাত্র চারটি মাত্রা দেখছি এবং বাকী চারটি মাত্রা দেখছি না। ঠিক সেরকম আরেকটি জগৎ রয়েছে যেখানকার অধিবাসীরা শুধু তাদের চারটি মাত্রা দেখেছে এবং আমাদের চারটি মাত্রা দেখছে না। তাহলে একই সাথে থাকবে দুটি জগৎ, একটি আমরা দেখতে পাব আরেকটি পাব না।

প্রফেসর রাউথ অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ সবই ছিল কল্পনার ব্যাপার। সেটার বাস্তব সম্ভাবনা প্রমান করা যায় শুধু মাত্র অংক কষে। আমি অনেকদিন থেকে এর ওপরে কাজ করছিলাম, আজ আমি সেটার সমাধান বের করেছি। কি দেখেছি জান?

কি?

দেখেছি আমাদের জগতের বাইরে আরেকটি চতুর্মাত্রিক জগৎ রয়েছে। সেই জগৎ একই সাথে আমাদের পাশাপাশি বেঁচে রয়েছে। সম্ভবত সময়ের মাত্রা দুটি জগতেই এক, সে অংশটুকু এখনো বের করা হয়নি।

ট্রিনিটি জিজ্ঞেস করল, সেখানে গ্রহ নক্ষত্র আছে? সেখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে?

এসব হচ্ছে খুটিনাটি ব্যাপার। কারো পক্ষে বলা খুব কঠিন, কিন্তু তা খুবই সম্ভব।

পৃথিবীর মানুষ সেই জগতের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে?

প্রফেসর রাউথের মুখ হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে উঠে মাথা নেড়ে বললেন, মনে হয় পারবে না। আমার হিসেব যদি ভুল না হয় তাহলে সেটার চেষ্টা করা হবে খুব ভয়ানক বিপদের কাজ।

কেন?

কারণটা খুব সহজ। আমাদের জগৎ আর সেই জগতের মাঝে শক্তির একটা বড় পার্থক্য রয়েছে। আমরা সেটা অনুভব করি না, সেই জগতেও সেটা অনুভব করে না। কিন্তু কোনভাবে যদি দুই জগতের মাঝে একটা যোগাযোগ করে দেয়া যায় তাহলে যে জগতের শক্তি বেশী সেখানকার বাড়তি শক্তি পুরো জগৎটাকে ঠেলে অন্য জগতে পাঠিয়ে দেবে।

মানে? ট্রিনিটি বোঝার চেষ্টা করে, আপনি বলছেন কেউ যদি যোগাযোগ করার চেষ্টা করে হঠাৎ করে এখানে সম্পূর্ণ একটা নুতন জগৎ নতুন গ্রহ নক্ষত্র হাজির হয়ে যেতে পারে?

প্রফেসর রাউথ অল্প মাথা নেড়ে বললেন, অনেকটা সেরকম। কিন্তু সেই ব্যাপারটা হয়তো তত খারাপ নয় খারাপ হচ্ছে পদ্ধতিটা। যখন পুরো জগৎ একটি ছোট গর্ত দিয়ে বের হয়ে আসতে থাকবে—চিন্তা করতে পার কি ভয়ানক বিপর্যয়?

তার মানে আপনি বলছেন যে জগৎটার শক্তি বেশী সেটার ভয় বেশী, যে কোন মুহূর্তে সেটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে?

কথাটা খানিকটা সত্যি। দুটি জগৎ রয়েছে এখানে, একটা নিশ্চিত জগৎ, আরেকটা অনিশ্চিত জগৎ। যেটা অনিশ্চিত সেটা যে কোন মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

আমাদের জগৎ কোনটি? যেটি নিশ্চিত সেটি নাকি যেটি অনিশ্চিত সেটি?

জানি না। সত্যি কথা বলতে কি সেটা কোনদিন জানা সম্ভব হবে কিনা সেটাও আমি জানি না। কেউ যদি ছোট একটা পরীক্ষা করে বের করতে চায় অনিশ্চিত জগৎটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

কি ভয়ানক?

হ্যাঁ, ভয়ানক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক কোণায় একটি ছোট ফুটো করে অন্য জগৎটিকে টেনে নিয়ে এসে ধ্বংস করে দেয়া যায়।

কি ভয়ানক! ট্রিনিটির যান্ত্রিক মস্তিষ্কের পুরো ব্যাপারটি অনুভব করতে রীতিমত কষ্ট হয়।

প্রফেসর রাউথ বিছানায় শুয়ে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিতেই তার সেই আশ্চর্য অনুভূতিটি হল, মনে হল কেউ যেন তার দিকে এক দৃষ্টিতে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। তিনি অস্বস্তিতে মাথা ঘুরিয়ে চারিদিকে তাকালেন, কোথাও কেউ নেই কিন্তু কি বাস্তব অনুভূতি। নিজেকে শান্ত করে কোনভাবে ঘুমানোর চেষ্টা করেন। মাথার কাছে একটা শিরা দপ দপ করছে, সহজে ঘুম আসতে চায় না। কি সাংঘাতিক একটা জিনিস তিনি বের করেছেন, কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ কেউ নেই যার কাছে এটা নিয়ে গল্প করতে পারেন। আহা আজ যদি তার স্ত্রী বেঁচে থাকত সুদীর্ঘ কুড়ি বছর আগে মৃত স্ত্রীর কথা স্মরণ করে তিনি একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ভোর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল প্রফেসর রাউথের। কিছু একটা হয়েছে কোথাও। তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না কি। চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন তিনি, ঘরে নীল একটা আলো, কোথা থেকে আসছে এটি?

চোখ মেলে তাকালেন তিনি, তার সামনে ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় মেঝে থেকে খানিকটা উপরে চতুষ্কোণ একটা জায়গা থেকে হালকা নীল রংয়ের একটা আলো বের হচ্ছে, ভাল করে না তাকালে দেখা যায় না।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন প্রফেসর রাউথ। ধীরে ধীরে আলোটি উজ্জ্বল হতে থাকে। আস্তে আস্তে সেখানে এক জোড়া চোখ স্পষ্ট হয়ে উঠে। চোখের দৃষ্টিতে বিষণ্ণ এক দৃষ্টি চোখ দুটি তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রফেসর রাউথ কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখেন, আজীবন গণিতের সাধনা করে এসেছেন, যুক্তিতর্ক ছাড়া কিছু বিশ্বাস করেন না। নিজেকে বোঝালেন, আমি ভুল দেখছি, সারাদিন পরিশ্রম করে আমার রক্তচাপ বেড়ে গেছে তাই চোখে বিভ্রম দেখছি। বিশ্রাম নিলে সেরে যাবে। আমি এখন চোখ বন্ধ করব, একটু পর যখন চোখ খুলব তখন দেখব কোথাও কিছু নেই।

প্রফেসর রাউথ চোখ বন্ধ করে কয়েকটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলেন তারপর ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। চোখ খুলে দেখলেন নীলাভ চতুষ্কোণ অংশটুকু এখনো আছে, চোখ দুটি এখনো এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু তাই নয় তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটিতে এবার পলক পড়ল, প্রফেসর রাউথ নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখলেন নীলাভ অংশটুকু ধীরে ধীরে আরো বড় হয়ে উঠছে, চোখ দুটির সাথে সাথে আস্তে আস্তে মুখের আরো খানিকটা দেখা যাচ্ছে একজন বিষণ্ণ মানুষের চেহারা করুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রফেসর রাউথ বিছানায় উঠে বসেন, সাথে সাথে নীলাভ চতুষ্কোণের চোখ দুটিতে ভীতি ফুটে ওঠে। তাকে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে তিনি বুঝতে পারেন না সেটি কি। প্রফেসর রাউথ বিছানা থেকে নেমে আসেন, সাথে সাথে চোখ দুটি আতঙ্কে স্থির হয়ে যায়, যন্ত্রণাকাতর একটি মুখ আবার তাকে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে। প্রফেসর রাউথ এক মুহূর্ত দ্বিধা করে এক পা এগিয়ে যান, সাথে সাথে পুরো নীলাভ অংশটুকু দপ করে নিভে গেল।

প্রফেসর রাউথ বাতি জ্বালালেন, যেখানে চোখ দুটি ছিল সে জায়গাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। কোথাও কিছু নেই— তার কেন জানি একটু ভয় ভয় করতে থাকে। কেন এরকম অস্বাভাবিক জিনিস তিনি দেখলেন? প্রফেসর রাউথ ঘর থেকে বের হয়ে ডাকলেন ট্রিনিটি।

ট্রিনিটি কোন সাড়া দিল না, তখন তার মনে পড়ল খরচ বাঁচানোর জন্য আজকাল রাতে তাকে সুইচ বন্ধ করে রাখা হয়। তাকে জাগাবেন কি না কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বাইরে এসে বসলেন। পুরো ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করলেন আবার। যেদিন থেকে গাণিতিক সমস্যাটার সঠিক সমাধানটি তার মাথায় এসেছে সেদিন থেকে তার মনে হচ্ছে কেউ একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু আগে দেখলেন সত্যি সত্যি কেউ একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে। সত্যি দেখেছেন তিনি, নাকি চোখের বিভ্রম; সত্যি তো হতে পারে না কিন্তু চোখের বিভ্রম কেন হবে? বয়স হয়েছে তার, কিন্তু তার মস্তিষ্কে তো এখনো কৈশোরের সজীবতা।

বৃদ্ধ প্রফেসর রাউথ বসে বসে ভোরের আলোকে ফুটে উঠতে দেখলেন, অকারণে তার মন খারাপ হয়ে রইল।

প্রাতঃরাশ করার সময় ট্রিনিটি প্রফেসর রাউথকে জানাল যে, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান আকাদেমী থেকে তাকে নেয়ার জন্যে গাড়ী পাঠানো হয়েছে। এক ঘন্টার ভিতর তাকে যেতে হবে। শুনে প্রফেসর রাউথ একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন, তার সাথে বিজ্ঞান আকাদেমীর কোন যোগাযোগ নেই প্রায় দুই দশক।

প্রফেসর রাউথের মুখে হতচকিত ভাব দেখে ট্রিনিটি বলল, গতকাল আপনি যে সমস্যাটি সমাধান করেছেন সম্ভবতঃ সেটি বিজ্ঞান আকাদেমীকে অভিভূত করেছে।

প্রফেসর রাউথ দুশ্চিন্তিত মুখে বললেন, তুমি ওদের জানিয়ে দিয়েছ?

না, আমি বিজ্ঞান আকাদেমীকে জানাই নি, কিন্তু গণিত জার্নালে একটা ছোট সারাংশ পাঠিয়েছি। সেটা তো আমি সব সময়েই পাঠাই। আপনি তো তাই বলে রেখেছেন।

হ্যাঁ, প্রফেসর রাউথ মাথা নাড়লেন, আমার ভুল হয়েছে। এই ব্যাপারটা আরো কিছুদিন গোপন রাখা উচিত ছিল তোমাকে আমার বলে দেয়া উচিত ছিল।

আমি দুঃখিত প্রফেসর রাউথ। ট্রিনিটি তার গলার স্বরে শঙ্কা ফুটিয়ে বলল, আমি খুবই দুঃখিত। আপনার কি কোন সমস্যা হবে?

জানি না। আমি বিজ্ঞান আকাদেমীকে পছন্দ করি না। তারা সবসময় জোর করার চেষ্টা করে। আমি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পছন্দ করি।

ট্রিনিটি ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল, আমি দুঃখিত প্রফেসর রাউথ।

তোমার দুঃখীত হবার কোন কারণ নেই ট্রিনিটি। প্রফেসর রাউথ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, গতকাল আমি যেসব কাজ করেছি সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে পারবে?

সর্বনাশ! কি বলছেন? এত দিনের কাজ-

ভয় পেয়ো না, প্রফেসর রাউথ মাথায় টোকা দিয়ে বললেন, সব এখানে রয়ে গেছে। যখন প্রয়োজন হবে কাগজে আবার বের করে নিতে এবারে কোন সময় লাগবে না।

সাদা একটা হলঘরে বসে আছেন প্রফেসর রাউথ। যদিও বিজ্ঞান আকাদেমীর গাড়ীতে চেপে তিনি এসেছেন, তাকে কিন্তু বিজ্ঞান আকাদেমীর ভবনে না এনে সরকারী একটা ভবনে আনা হয়েছে। ভবনটি অত্যন্ত সুরক্ষিত, এখানে নানা ধরনের প্রহরা, ব্যাপারটি দেখে তার মনে কেমন জানি একটা খটকা লাগতে থাকে।

আসবাবপত্রহীন শূন্য ঘরটিতে দীর্ঘ সময় এক একা বসে থাকার পর হঠাৎ করে কয়েকজন লোক প্রবেশ করে, তাউকেই তিনি চিনেন না। একজনকে মনে হল আগে কোথায় জানি দেখেছেন। কিন্তু ঠিক মনে করতে পারলেন না।

লোকগুলো তাকে ঘিরে বসে পড়ে। চেনা চেনা লোকটি খানিক্ষণ এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থেকে মুখে একটা ধূর্ত হাসি ফুটিয়ে বলল, আপনি আমাকে চিনতে পারেননি।

না। মনে হচ্ছে কোথায় দেখেছি, কিন্তু-

ভারী আশ্চর্য! আমি এদেশের রাষ্ট্রপতি রিবেনী।

প্রফেসর রাউথ চমকে উঠে সোজা হয়ে বসলেন। এই ভন্ড প্রতারক লোকটির অসংখ্য নিষ্ঠুরতার গল্প প্রচলিত রয়েছে। ঢোক গিলে শুকনো গলায় বললেন, আমি দুঃখীত। আমি

রাষ্ট্রপতি রিবেনী হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমার কাছে খবর এসেছে আপনি নাকি একটি অস্বাভাবিক আবিষ্কার করেছেন। শুনে খুশী হবেন আপনার কাজ শেষ করার জন্য এই মুহূর্তে সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের নিয়ে একটা ইন্সটিটিউট খোলা হচ্ছে। আপনার নামে সেই ইন্সটিটিউট উৎসর্গ করা হবে।

একটি দেশের রাষ্ট্রপতির সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় প্রফেসর রাউথের জানা নেই। তাই বাধা দেয়ার প্রবল ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও তিনি কাঠ হয়ে বসে রইলেন।

রাষ্ট্রপতি রিবেনী মুখের ধূর্ত হাসিটি বিস্তৃত করে বললেন, আপনার কাজটুকু শেষ করুন। আপনার কি লাগবে আমাদের জানান। যত বড় কম্পিউটার চান, যতজন গণিতবিদ চান শুধু মুখে ফুটে বলবেন।

প্রফেসর রাউথ শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে বললেন, আমার কাজ তো কিছু বাকী নেই, যে জায়গাটাতে আটকে ছিলাম, গত রাতে শেষ হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি রিবেনীর চোখ এক মুহূর্তের জন্যে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে কিন্তু সেটা একটু মুহূর্তের জন্যেই। মুখে জোর করে একটা হাসি ফুটিয়ে বললেন, না আপনার কাজ শেষ হয়নি। আপনার এখনো দুটি জিনিস বের করতে হবে। একটা আমাদের জগৎটি নিশ্চিত না অনিশ্চিত। দুই নিশ্চিত এবং অনিশ্চিত জগতের মাঝে যোগাযোগ কেমন করে করা যাবে।

কিন্তু সেটা তো ভয়ানক বিপদজনক। ভয়ানক—

রিবেনী ধূর্ত চোখে তাকিয়ে বললেন, সেটাই তো সবচেয়ে বড় কথা। আমরা যদি নিশ্চিত জগতের অধিবাসী হই তাহলে অনিশ্চিত জগৎকে আমরা হাতের মুঠোয় রাখব। যখন খুশী আমরা তাদের ধ্বংস করে দিতে পারব, তখন তাদের কাছে আমরা যা খুশী তাই দাবী করতে পারব। চিন্তা করতে পারেন একটি পুরো জগৎ থাকবে আমাদের হাতের মুঠোয়। আমার হাতের মুঠোয়।

প্রফেসর রাউথ অবাক হয়ে দেখলেন, ব্যাপারটা কল্পনা করে রাষ্ট্রপতি রিবেনীর মুখে একটা নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠছে। বিষাক্ত সরিসৃপ দেখে যেরকম একটা ভয় হয় হঠাৎ সেরকম একটা ভয় অনুভব করলেন প্রফেসর রাউথ। প্রায় মরিয়া হয়ে বললেন, কিন্তু আমরা যদি অনিশ্চিত জগতের অধিবাসী হই?

সেটা আপনাকে বের করতে হবে প্রফেসর রাউথ। অনিশ্চিত জগৎ হলেই যে ব্যাপারটা অন্যরকম হবে সেটা কেন ভাবছেন? তখন আমরা সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসব কারণ ইচ্ছে করলে তখন আমরা এই পুরো জগৎ ধ্বংস করে দিতে পারব, কি প্রচন্ড ক্ষমতা ভেবে দেখেছেন?

রাষ্ট্রপতি রিবেনী প্রফেসর রাউথের চোখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে বললেন, কিন্তু সবার আগে আমাদের জানা দরকার আমরা কি নিশ্চিত জগতের অধিবাসী নাকি অনিশ্চিত জগতের অধিবাসী। আর জানা দরকার কেমন করে এই দুই জগতের যোগাযোগ করা যায়।

রাষ্ট্রতি রিবেনী মুখের হাসিকে বিস্তৃত করে বললেন, আপনাকে এক সপ্তাহ সময় দেয়া হল।

প্রথমবার প্রফেসর রাউথ অনুভব করলেন অসহ্য একটা ক্রোধ ধীরে ধীরে তার শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে, দীর্ঘদিন থেকে তার এই অনুভূতির সাথে পরিচয় নেই। অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বললেন, যদি এক সপ্তাহে আমি সেটা বের না করি?

না শোনার ভান করলেন রাষ্ট্রপতি রিবেনী। মাথা নেড়ে বললেন, আপনি বড় গণিতবিদ, এক সপ্তাহে সহজেই বের করে ফেলবেন আপনি, তাছাড়া আপনাকে সাহায্য করবে অসংখ্য প্রথমশ্রেণীর কম্পিউটার, অসংখ্য শক্তিশালী কম্পিউটার।

কিন্তু আমি যদি এটা করতে অস্বীকার করি?

প্রথমবারের মত রাষ্ট্রপতি রিবেনীর মুখের মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়, আস্তে আস্তে বললেন, আপনি অস্বীকার করবেন না প্রফেসর রাউখ। আমার অনুরোধ রাখতে কেউ অস্বীকার করে না—এখনো করেনি।

কিন্তু—

রিবেনী বাধা দিয়ে বললেন, তবু যদি আপনি অস্বীকার করেন, তাহলে আপনার মস্তিষ্কটা নিয়ে জুপো কম্পিউটারের সাথে জুড়ে দেব। আমাদের যা বের করার দরকার সেটা খুব সহজেই বের করা যায় প্রফেসর রাউখ, আপনাকে আর কষ্ট করতে হয় না তাহলে।

অনেক কষ্ট করেও প্রফেসর রাউখ তার আতঙ্কটুকু লুকাতে পারলেন না। রাষ্ট্রপতি রিবেনী প্রফেসর রাউখের রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে অমায়িকভাবে হাসলেন। বললেন, আপনার মস্তিষ্ক এভাবে আমি নিতে চাই না, নেহায়েৎ আপনি যদি জোর করেন তাহলে ভিন্নকথা।

ঠিক এ সময়ে সামরিক বাহিনীর দু'জন উচ্চপদস্থ লোক এসে রাষ্ট্রপতি রিবেনীর কানে ফিস ফিস করে কি একটা বলল সাথে সাথে রিবেনী উঠে দাঁড়ালেন, প্রফেসর রাউখকে কোন সম্ভাষণ না জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন পিছু পিছু অন্য সবাই। প্রফেসর রাউখ শূন্য ঘরে একা একা বসে রইলেন। তার সমস্ত মুখে একটা তেতো বিস্বাদ ভাব।

প্রফেসর রাউখ ঘরে নিজের বিছানায় দুই পা তুলে চুপচাপ বসে রয়েছেন। কিছুক্ষণ আগে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের লোকজন এসে তার সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়ে গেছে। সরকারী মহল থেকে তাদের উপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে প্রায় অপরিচিত এই বৃদ্ধ লোকটিকে রাতারাতি মহামানবের পর্যায়ে তুলে নিতে হবে। প্রফেসর রাউখের ইচ্ছে অনিচ্ছের কোন মূল্য নেই, তার কলের পুতুলের মত অন্যের নির্দেশ মেনে নেয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না। তার চোখের সামনে সংবাদপত্রের লোকেরা তার সাদামাটা জীবনের ওপর রং চড়িয়ে তাকে একটা অতিমানবিক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করে ফেলল।

রাত গভীর হয়ে এসেছে। প্রফেসর রাউখের চোখে ঘুম নেই। দুহাতে মাথা চেপে ধরে তিনি বিছানায় বসে অনেকটা আপন মনে বললেন, আমার বেঁচে থাকার আর কোন অর্থ নেই। আমার সব শেষ হয়ে গেল। সব শেষ—

প্রফেসর রাউখ

অপরিচিত একটা গলার স্বরে প্রফেসর রাউখ চমকে উঠে সামনে তাকান। ঘরের মাঝামাঝি আবার সেই চতুষ্কোণ নীলাভ আলো। তার মাঝে একজন মানুষের মুখমন্ডল। মানুষটি বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। প্রফেসর রাউখ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলেন, তিনি কি সত্যি দেখছেন?

মানুষটি আবার ফিস ফিস করে ডাকল, প্রফেসর রাউখ।

মানুষটির বিষণ্ণ চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ প্রফেসর রাউখ সব কিছু বুঝে গেলেন। আটকে থাকা নিঃশ্বাসটি আস্তে আস্তে বুক থেকে বের করে বললেন, তুমি অনিশ্চিত জগতের অধিবাসী?

হ্যাঁ প্রফেসর রাউখ। নীলাভ চতুষ্কোণের ছায়ামূর্তি যান্ত্রিক ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলল, আমরা অনিশ্চিত জগতের অধিবাসী, আমরা আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি।

প্রফেসর রাউখ দেখলেন, ছায়ামূর্তির পিছনে আরো অনেক মানুষের চেহারা। খুব ধীরে ধীরে তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠে। আস্তে আস্তে বললেন, তোমরা তোমাদের অনিশ্চিত জগতকে রক্ষা করার জন্য আমার কাছে এসেছ?

আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন প্রফেসর রাউখ।

কয়েক মুহূর্তে কি একটা ভাবলেন প্রফেসর রাউখ, তারপর দ্বিধান্বিত স্বরে বললেন, অচিন্তনীয় শক্তির পার্থক্য তোমাদের সাথে আমাদের, সেই শক্তিকে আটকে রেখে তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পার? আমার সাথে কথা বলতে পার?

পারি।

কি আশ্চর্য। তার মানে জ্ঞানে বিজ্ঞানে তোমরা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছ। অনেক অনেক এগিয়ে আছ।

আছি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইলেন প্রফেসর রাউখ। তারপর হঠাৎ তার এক আশ্চর্য সম্ভাবনার কথা মনে হল। একটু দ্বিধা করে প্রকাশ করে ফেলেন সেটা, তোমরা আমার উপর অনেক দিন থেকে নজর রাখছো?

রেখেছি। সেজন্যে আমরা দুঃখিত। আমরা ক্ষমা চাইছি।

তোমরা জানতে আমি এই সমস্যার সমাধান করতে যাচ্ছি?

জানতাম।

আমাকে ইচ্ছা করলে তোমরা থামাতে পারতে?

পারতাম।

প্রফেসর একটু দ্বিধান্বিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে মেরে ফেলতে পারতে?

পারতাম প্রফেসর রাউখ।

তাহলে- তাহলে আগেই কেন তোমরা আমাকে শেষ করে দিলে না?

আপনি স্বৈরাচারী শাসক নন প্রফেসর রাউখ, আপনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ। আপনাকে হত্যা করার অধিকার আমাদের নেই।

কিন্তু আমি যে সমস্যাটা সমাধান করেছি সেটা না করতে পারলে কেউ তোমাদের জগতের কথা জানতে পারত না। আমাকে থামিয়ে দিলে তোমাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা থাকত।

কিন্তু আপনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ আপনার গণিত সাধনায় আমরা কিভাবে বাধা দিই? আপনার আনন্দে তো আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না।

কিন্তু আমি যেটা সমাধান করেছি সেটার জন্যে তোমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারত।

ছায়ামূর্তি গভীর আত্মবিশ্বাসে মাথা নাড়ে, না, পারত না। আমরা আপনাকে জানি। আমরা জানি আপনি আপনার গবেষণালব্ধ জ্ঞান কখনো ধ্বংসের জন্যে ব্যবহার করবেন না।

প্রফেসর রাউখ একটু অস্থির হয়ে বললেন, কিন্তু সেটা তো আমার হাতে নেই, সেটা তো জানাজানি হয়ে গেছে।

আপনার সমাধানটি কারো হাতে নেই, আপনি নিজের হাতে সেটি নষ্ট করেছেন। সমাধানটি ছাড়া এই তথ্যটির কোন মূল্য নেই। এই তথ্যটি আরেকটি কাল্পনিক সূত্র। আপনি ছাড়া আর কেউ সেই সমাধানটি করতে পারবে না।

কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে আমি যদি সেই সমাধানটি না করে দিই আমার মস্তিষ্ক নিয়ে নেয়া হবে, আমাকে ভয় দেখিয়েছে রিবেনী। রিবেনীর অসাধ্য কিছু নেই হঠাৎ প্রফেসর রাউখ থেমে গেলেন, বিষণ্ণ চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে বুঝে গেলেন অনিশ্চিত জগতের অধিবাসীরা কি চাইছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রফেসর রাউখ খুব ধীরে ধীরে বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা কেন আমার কাছে এসেছ।

আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

প্রফেসর রাউখ একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোমাদের দুঃখিত হবার কিছু নেই।

আমাদের আর কোন উপায় ছিল না প্রফেসর রাউখ।

আমি বুঝতে পারছি।

আপনার কথা আমরা আজীবন মনে রাখব। আমাদের জগৎ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনার মত মানুষ এই জগৎকে সুন্দর করে রেখেছে প্রফেসর রাউখ।

প্রফেসর রাউখ কিছু বললেন না। চতুষ্কোনের ভিতর থেকে ছায়ামূর্তি বলল, আমাদের হাতে খুব বেশী সময় নেই।

বেশ, কি করতে হবে বল।

আপনাকে কিছু করতে হবে না। আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন।

প্রফেসর রাউখ বিছানায় শুয়ে চাদরটি নিজের শরীরে টেনে দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আকাশে চাঁদ উঠেছে, তার ম্লান জ্যোৎস্না কোমল হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কি অপূর্ব দৃশ্য, কখনো ভাল করে দেখেননি। শেষ মুহূর্তে এই অস্বাভাবিক সৌন্দর্য দেখে পৃথিবীর জন্যে গাঢ় বিষাদে মন ভরে উঠছে।

চতুষ্কোণ নীলাভ জানালা থেকে তীব্র এক ঝলক আলো বের করে আনে প্রফেসর রাউখের দিকে।

* * *

রাষ্ট্রপতি রিবেনী হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেন। আশ্চর্য একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেছে তার। কারা যেন তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। বিশ্বজগতের প্রতি ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য। কি আশ্চর্য স্বপ্ন।

রিবেনী চুপ করে বসে থাকেন, তার হঠাৎ করে মনে হয় কেউ একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে। মাথা ঘুরিয়ে চারিদিকে তাকান রাষ্ট্রপতি রিবেনী। কেউ কোথাও নেই, কিন্তু কি বাস্তব একটা অনুভূতি।

অকারণে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল তার।

স্বপ্ন

ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে বসে জুলিয়ান। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে, গলা শুকিয়ে কাঠ। হাতড়ে হাতড়ে মাথার কাছে রাখা টেবিল থেকে পানির গ্লাসটা তুলে ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে গ্লাসটা শেষ করে দেন। ধাক ধাক করে হৃদপিন্ড শব্দ করছে বুকের ভিতর, অনেকক্ষণ লাগে নিজেকে শান্ত করতে। কি আশ্চর্য একটা স্বপ্ন দেখেছেন তিনি।

বিছানা থেকে নেমে জানলার কাছে এসে দাঁড়ান জুলিয়ান, ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, পথঘাট পানিতে ভিজে চকচকে। ল্যাম্প পোস্টের আলো ছায়া পড়েছে রাস্তায়। বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে জুলিয়ান আপন মনে বললেন, কি আশ্চর্য স্বপ্ন।

স্বপ্নটা ঘুরে ফিরে মাথার মাঝে খেলা করে তার, আশ্চর্য একটা স্বপ্ন, অথচ যতক্ষণ স্বপ্নটি দেখছিলেন ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারেননি তিনি স্বপ্ন দেখছেন। মনে হচ্ছিল সত্যি বুঝি সব কিছু ঘটে যাচ্ছে তার জীবনে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে জুলিয়ানের মনে হল এমন কি হতে পারে যে তিনি এখনো স্বপ্ন দেখছেন? এই গভীর রাতে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, বাইরে বৃষ্টি ভেজা চকচকে পথ আর ল্যাম্পপোস্টের ছায়া সবই আসলে একটি স্বপ্ন? তার মনে হয়েছে যে ঘুম ভেঙে গেছে, আসলে ভাঙেনি? কি নিশ্চয়তা আছে যে তিনি সত্যি জেগে আছেন?

জুলিয়ান ঘরে ভিতরে তাকালেন, না এটা স্বপ্ন নয়। ঐতো তার পরিচিত চেয়ার টেবিল, বইয়ের শেল্ফ, বিছানা। ঐ তো আবছা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে বিছানায় ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছে তার স্ত্রী।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জুলিয়ান আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকান আর তক্ষুণি হঠাৎ তার একটা আশ্চর্য জিনিস মনে হল। এমন কি হতে পারে, যে জীবনটাকে তিনি তার জীবন বলে জেনে এসেছেন সেটা আসলে কোন একজনের স্বপ্ন? এই ঘর, চেয়ার, টেবিল বইয়ের শেল্ফ, জানালা, জানালার পাশে ঝিরঝির বৃষ্টি সবই সেই স্বপ্নের দৃশ্য? তার মধুর শৈশব, বর্ণাঢ্য যৌবন হাসি কান্না মিলিয়ে

চমৎকার জীবনটা আসলে কারো স্বপ্নের কয়েকটা মুহূর্ত? চারপাশের পৃথিবী সেই স্বপ্নের ছায়া? এমন কি হতে পারে?

জোর করে চিন্তাটা সরিয়ে রাখতে চান জুলিয়ান কিন্তু পারেন না। ঘুরে ফিরে তার বার বার মনে হতে থাকে যে, তিনি হয়তো স্বপ্ন দেখছেন। শুধু যে স্বপ্ন তাই নয়, হয়তো অন্য কারো স্বপ্ন। হয়তো জুলিয়ান বলে কেউ নেই, তার পুরো জীবনটা আসলে তেমন একজনের স্বপ্নের কয়েকটি মুহূর্ত।

ভাবতে ভাবতে জুলিয়ান উত্তেজিত হয়ে উঠেন, তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। নিজেকে প্রতারিত মনে হয় তার, ক্রোধ জমে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে। স্বপ্নটা ভেঙে জেগে উঠার একটা অদম্য ইচ্ছা হতে থাকে আস্তে আস্তে। কিন্তু স্বপ্নটা ভাঙবেন কেমন করে?

জুলিয়ানের মনে পড়ে একটু আগে তার স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল যন্ত্রণায়, দেখছিলেন, অসংখ্য বুনো কুকুর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠেছেন তিনি আর সাথে সাথে ঘুম ভেঙে গেছে তার। তাহলে কি যন্ত্রণা দিয়ে স্বপ্ন ভেঙে দেয়া যায়? নিশ্চয়ই যায়। যন্ত্রণা যখন সহ্যের বাইরে চলে যায় তখন স্বপ্ন আর স্বপ্ন থাকতে পারে না, স্বপ্ন তখন ভেঙে যায়। জুলিয়ানের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠে, কোনভাবে অমানুষিক যন্ত্রণা দিতে পারেন না নিজেকে?

চুপি চুপি জুলিয়ান নীচে নেমে আসেন। সিঁড়ির নীচে ঘরের ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি রাখা আছে। হাতড়ে হাতড়ে হ্যান্ড ড্রিলটি বের করে দেয়াল ফুটো করার আট নম্বর ড্রিল বিটটা লাগিয়ে নেন সাবধানে। পা টিপে টিপে বাথরুমে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ান তিনি, উত্তেজনায় তখন তার হাত কাঁপছে। সুইচ টিপে দিতেই ড্রিল বিটটা ঘুরতে শুরু করে, কংক্রীট ফুটো করা যায়। এটা দিয়ে কপালের উপর চেপে ধরলে মাথার খুলি ফুটো হয়ে যাবে অনায়াসে।

জুলিয়ান কাঁপা হাতে হ্যান্ড ড্রিলটা তুলে কপালের উপর চেপে ধরেন, প্রচন্ড আর্তনাদ করে উঠেন পর মুহূর্তে...

* * *

ঝিলাবিলে প্রাণীটির ঘুম ভেঙে যায় দুঃস্বপ্ন দেখে। কি বিদঘুটে একটা স্বপ্ন। প্রাণীটি অবাক না হয়ে পারে না। পিটপিট করে তাকায় তার কয়েকটি চোখ মেলে, সূর্য দুটি অনেক উপরে উঠে গেছে। প্রাণীটি তার অসংখ্য ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটতে শুরু করে লাল রঙের পাথরের উপর দিয়ে।

আরেকটি সুদীর্ঘ দিন শুরু হল তার।

আমি রীবাক

বাসায় ফিরে এসে দেখি দরজার সামনে কফিনের মত বড় একটা বাক্স পড়ে আছে। ভিতরে কি আছে আন্দাজ করতে আমার অসুবিধে হল না। সপ্তাহ দুয়েক আগে স্থানীয় একটা রবোট কোম্পানী থেকে আমাকে ফোন করেছিল। তারা তাদের তৈরী রবোটের একটা বিশেষ মডেল আমাকে পাঠাতে চায়। আমি তাদের স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি যে রবোটে আমার কোন উৎসাহ নেই, বিশেষ করে বাসার মাঝে আমি কখনই রবোটকে জায়গা দিই না। সেটা শুনেও তারা নিরুৎসাহিত হয়নি, জোর করে বলেছে যে তবুও তারা আমার কাছে একটা রবোট পাঠাতে চায়। আমি বলেছি যে, আমার নিষেধ না শুনে আগেও বিভিন্ন রবোট কোম্পানী আমাকে নানারকম রবোট পাঠিয়েছে এবং প্রত্যেকবারই আমি সোজাসুজি সেগুলো জঞ্জালের মাঝে ফেলে দিয়েছি। শুনে তারা খানিকটা নমে গেল কিন্তু হাল ছাড়ল না, বলল আমি ইচ্ছে করলে তাদের রবোটকে জঞ্জালের মাঝে ফেলে দিতে পারি তারা কিছু মনে করবে না। কিন্তু তাদের বিশ্বাস আমি যদি রবোটটা এক নজর দেখি সেটা জঞ্জালে ফেলার আগে কিছুদিন পর্যবেক্ষণ করব। আমি হয়তো তখন তাদের আমার মন্তব্য জানাব, তারা এর বেশী কিছু আশা করে না।

যৌবনে রবোটের কম্পেট্রনের ভূমিকার উপর আমি কিছু কাজ করেছিলাম যেটা আমাকে সাময়িকভাবে বিখ্যাত করে তুলেছিল। কম্পেট্রনে যে সার্কিটটি রবোটের অনুভূতির সাথে যুক্ত সেটাকে এখনো আমার নামানুসারে রীবাক সার্কিট বলা হয়ে থাকে। আমি বহুকাল আগেই রবোট এবং কম্পেট্রনের উপর থেকে আগ্রহ হারিয়েছি, কিন্তু রবোট শিল্পের কর্মকর্তাদের মস্তিষ্কে এখনো সেটা কোনভাবে ঢোকানো যায়নি।

আমার বাসাটি ছোট, একা থাকি কাজেই বড় বাসার কোন প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিনি। বসার ঘরে রবোটের এই অতিকায় বাক্সটি অনেকটুকু জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। কাজেই প্রথমেই এটাকে জঞ্জালে ফেলার আমি একটা চমৎকার পদ্ধতি বের করেছি। বাক্স থেকে বের করে বলি, তুমি তোমার বাক্সটি নিয়ে জঞ্জালের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়।

কোন মডেলের রবোট তার উপর নির্ভর করে কখনো কখনো আরো কিছু কথাবার্তা হয়। শেষ রবোটটি বলেছিল আপনি কি সত্যিই চান আমি এটা করি?

হ্যাঁ, আমি চাই।

কিন্তু এটা কি অত্যন্ত অযৌক্তিক একটি আদেশ নয়?

সম্ভবত কিন্তু তবু তুমি জঞ্জালের বাক্সে ঝাঁপ দাও।

রবোটটি এপারো তালা থেকে জঞ্জালের বাক্সে ঝাঁপ দিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবার আগে আমাকে আরো একবার জিজ্ঞেস করেছিল, মহামান্য রীবাক, আপনি কি সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করে আমাকে এই আদেশটি দিচ্ছেন?

হ্যাঁ আমি সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করে তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি।

রবোটটি আমার সম্পর্কে একটা অত্যন্ত অসম্মানজনক উক্তি করে এপারো তালা থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল।

এবারেও তাই করার জন্যে আমি বাক্স খুলে রবোটটি বের করে তার কানের নীচে স্পর্শ করে সুইচটা অন করে দিলাম। রবোটের কম্পেট্রনের ভিতর থেকে খুব হালকা একটা গুঞ্জনের শব্দ শোনা গেল এবং অনেক সেকেন্ডের ভিতরেই তার ফটোসেলের চোখে রবোট সুলভ চাঞ্চল্য দেখা গেল। রবোটটি উঠে দাঁড়ানোর কোন চেষ্টা করল না, বাক্সের মাঝে শুয়ে থেকে জ্বলজ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আগে কখনো এ ধরনের কোন ব্যাপার ঘটেনি।

আমি বললাম, উঠে দাঁড়াও।

রবোটটি বাক্সের মাঝে শুয়ে থেকেই আমার দিকে তাকিয়ে রইল, উঠে দাঁড়ানোর কোন চেষ্টা করল না।

অবাধ্য রবোট তৈরী করা কি রবোট শিল্পের নতুন ধারা? আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, আবার বললাম, উঠ।

রবোটটি ফিস ফিস করে বলল, উঠ।

আমি বললাম, উঠে বস।

রবোটটি ফিস ফিস করে বলল, উঠে বস।

আমি একটু অবাক হলাম, যে কোম্পানী আমাকে রবোটটা পাঠিয়েছে বলা যেতে পারে তারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রবোট নির্মাতাদের একজন। আমার সাথে কোন রকম রসিকতা করার চেষ্টা করবে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রবোটটা অন্য দশটা রবোটের মত নয় বলাই বাহুল্য, আকারে মানুষের সমান, বেমানান বড় মাথা, বড় বড় সবুজ রঙের চোখ, কথা বলার জন্যে সংবেদনশীল স্পীকার, থামের মত একজোড়া পা এবং অত্যন্ত সাধারণ সিলিন্ডারের মত শরীর। তবে এর আচার আচরণ অন্য দশটা রবোট থেকে ভিন্ন, এবং নিশ্চিতভাবেই এর কোন এক ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু সেটা ঠিক কি আমি বুঝতে পারলাম না। আমি রাতের খাবার শেষ করে আবার রবোটটাকে নিয়ে বসব ঠিক করে খাবার ঘরে চলে এলাম।

ভাল খেতে খুব যে বেশী পরিশ্রম করতে হয় সেটি সত্যি নয়। কিন্তু যেটুকু করতে হয় আমি সেটাও করতে রাজী নই। তাই প্রায় প্রতিরাতেই আমি একই ধরনের বিস্বাদ কিন্তু মোটামুটি পুষ্টিকর খাবার খেয়ে থাকি। খাবার সময় আমি সাধারণতঃ একটা ভাল বই নিয়ে বসি, পড়ার মাঝে ডুবে গেলে খাওয়া ব্যাপারটি আর সেরকম যন্ত্রণাদায়ক মনে হয় না। বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় লেখা একটা রগরগে খুন জখমের বই শুরু করেছি। আমি সেটা হাতে নিয়ে খাবার টেবিলে এলাম।

খাবারের শেষ পর্যায়ে এবং বইয়ের মাঝামাঝি অংশে হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমি মুখ তুলে তাকালাম। দেখি রবোটটা তার বাক্স থেকে বের হয়ে এসেছে। আগে লক্ষ্য করিনি, প্রচলিত রবোটের মত এটি পদক্ষেপ করতে পারে না। পায়ের নীচে ছোট ছোট চাকা রয়েছে, সেগুলো ঘুরিয়ে এটি সামনে পিছে যায়। রবোটটা প্রায় নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকেছে, আমাকে মুখ তুলে তাকাতে দেখে সেটা সন্তর্পণে আমার দিকে এগিয়ে এল। কাছাকাছি এসে সেটি তার হাত তুলে খুব সাবধানে আমার হাতকে স্পর্শ করল। আমি হঠাৎ করে লক্ষ্য করলাম রবোটটার হাত দুটি অত্যন্ত যত্ন করে তৈরী করা হয়েছে, অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু এর দুটি হাত প্রায় মানুষের হাতের মত। শুধু তাই নয় হাতের স্পর্শটি ধাতব এবং শীতল নয়, জীবন্ত প্রাণীর মত উষ্ণ এবং কোমল। আমি বললাম, এখান থেকে যাও।

রবোটটি আমার কথা বুঝতে পারল বলে মনে হলে না। ফিস ফিস করে বলল, যাও।

খানিক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ সেটি ঘরের কোনার দিকে হেঁটে গেল। সেখানে প্রাচীন মায়া সভ্যতা থেকে উদ্ধার করা একটি সূর্য দেবতার মূর্তি সাজানো আছে। রবোটটি মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটি লক্ষ্য করতে থাকে। ধীরে ধীরে সে হাত বাড়িয়ে মূর্তিটিকে স্পর্শ করে। তারপর ঘুরে আমার দিকে তাকায়। আবার মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলে, উঠ।

রবোটটির আচার আচরণে একটা শিশু সুলভ ভাব রয়েছে। আমি খানিক্ষণ সেটা লক্ষ্য করে আবার আমার রগরগে খুন জখমের বইয়ে ডুবে গেলাম।

রাতে ঘুমানোর আগে রবোটটির ব্যাপারে কিছু একটি নিষ্পত্তি করার কথা ভাবছিলাম। যদি আজ রাতে জঞ্জালের বাক্সে নাও ফেলি অন্ততঃ সুইচ অফ করে সেটাকে বিকল করে রাখা দরকার। আমি রবোটটাকে আমার লাইব্রেরী ঘরে আবিষ্কার করলাম, সেটি টেবিলের উপর রাখা ফুলের তোড়াটি গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে। একবার একটু কাছে থেকে দেখে তারপর আবার আরেকটু দূর থেকে দেখে। একবার মাথাটি ডানদিকে কাত করে দেখে তারপর আবার বাম দিকে কাত করে দেখে। মাঝে মাঝে খুব সাবধানে ফুলটাকে স্পর্শ করার চেষ্টা

করে। রবোটের এরকম একাগ্রতা আমি আগে কখনো দেখিনি। আমার পায়ের শব্দ শুনে সেটি আমার দিকে ঘুরে তাকাল এবং হাত দিয়ে ফুলটিকে দেখিয়ে একটা অবোধ্য শব্দ করল, ছোট শিশুরা যেরকম অর্থহীন অবোধ্য শব্দ করে অনেকটা সেরকম। রবোটের ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে কোন অসুবিধা হল না যে সে আগে কখনো ফুল দেখেনি। আমি ফুলটা দেখিয়ে বললাম, ফুল।

রবোটটা আমার সাথে সাথে ফিস ফিস করে বলল, ফুল।

আমি যেন জানি সুইচ অফ করে রবোটটাকে বিকল করে দিতে পারলাম না। এটি একটি সাবধানী নিরীহ এবং অত্যন্ত কৌতূহলী রবোট, এর আচার আচরণ শিশুদের মত। দেখে আমার কোন সন্দেহ রইল না যে, একে বিকল করে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। রবোটটিকে ঘুর ঘুর করে ঘুরতে দিয়ে আমি আমার রগরগে বইটি নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে প্রথমে রবোটটিকে খুঁজে পেলাম না, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। কাজেই সে বাইরে যায়নি, ভিতরেই কোথাও আছে খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত আমি তাকে বসার ঘরে তার বাক্সের মাঝে আবিষ্কার করলাম। সেখানে সেটি চোখ বন্ধ করে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। আমি এর আগে কোন রবোটকে ঘুমাতে দেখিনি।

আমার পায়ের শব্দ শুনে রবোটটা চোখ খুলে আমার দিকে তাকাল তারপর ফিস ফিস করে বলল, ফুল।

আমার পক্ষে হাসি আটকে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল, আমাকে এর আগে কেউ ফুল বলে সম্বোধন করেছে বলে মনে পড়ে না। রবোটটা সম্পর্কে কয়েকটা জিনিস এতক্ষণে বেশ স্পষ্ট হয়েছে, তার একটা হচ্ছে আমি তার সাথে যে কয়টা কথা ব্যবহার করেছি এটি শুধুমাত্র সেই কথাগুলোই শিখেছে। কথাবার্তায় ঘুরে ফিরে শুধু সেই কথাগুলিই ব্যবহার করেছে। তাছাড়া এটাকে দেখে মনে হচ্ছে এর কপোট্রনে আগে থেকে কোন রকম বিশেষ জ্ঞান দেয়া হয়নি। সম্ভবতঃ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী একটা কপোট্রন এবং নতুন কিছু দেখে সেটা শেখার একটা ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মানব শিশুরা যেরকম দেখে দেখে শিখে এটাও সেরকম। আমি স্বীকার না করে পারলাম না এ ধরনের রবোটের কোন রকম ব্যবহারিক গুরুত্ব সম্ভবতঃ নেই কিন্তু এর বুদ্ধিমত্তা কিভাবে বিকাশ করে সেটি লক্ষ্য করা খুব চমৎকার একটি ব্যাপার হতে পারে।

রবোটটিকে জঞ্জালের বাক্সে ফেলে দিয়ে ধ্বংস করার পরিকল্পনাটি আপাতত স্থগিত রাখতে হল।

কিছুদিনের মাধ্যে আমি রবোটটা সম্পর্কে আরো কিছু আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করলাম। তার একটি বেশ বিচিত্র, রবোটটার সাথে কোন রকম কথোপকথন করা

যায় না। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেই সে প্রশ্নটি গভীর ভাবে চিন্তা করতে শুরু করে কিন্তু তার উত্তর দেয়ার কোন চেষ্টা করে না। আমাকে সে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে, আমার প্রতিটি কথা আচার আচরণ ভাবভঙ্গীকে সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অনুকরণ করার চেষ্টা করে। এক সময় লক্ষ্য করলাম তার কণ্ঠ স্বর অবিকল আমার মত হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয় তার উচ্চারণেও ঠিক আমার মত মধ্যদেশীয় আঞ্চলিকতার একটা সুক্ষ্ম টান। আমি যে বই পড়ি বা যে সঙ্গীত শুনি রবোটটাও সেই বই পড়ে এবং সেই সঙ্গীত শুনে। আমি যেরকম মাঝে মাঝে লেখালেখি করার চেষ্টা করি সেও সেরকম লেখালেখি করে। সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে তার টানা হাতের লেখা অবিকল আমার হাতের লেখার মত। একটা মাত্র জিনিস সে করতে পারে না সেটা হচ্ছে খাওয়া, কিন্তু আমি যখন কিছু খাই সে গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে।

আমি এর আগে কোন রবোটকে আমার কাছাকাছি দীর্ঘসময় রাখতে পারিনি, কিন্তু এর বেলা আমার কোন অসুবিধে হল না। যেহেতু তার সাথে কোন কথোপকথন হয় না, সে কখনো আমাকে কোন প্রশ্ন করে না, আমাকে কোন কাজে সাহায্য করতে চায় না, কখনই কোন ব্যাপারে মত প্রকাশ করে না, কাজেই তার অস্তিত্ব আমি মোটামুটিভাবে সবসময় ভুলে থাকি। প্রথম দিকে রবোটটিকে আমি একটা নাম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কোন লাভ হল না। রবোটটির আমার থেকে আলাদা কোন পরিচিতি নেবার ক্ষমতা নেই। এর কপেট্রনটি সম্ভবতঃ সেভাবেই প্রোগ্রাম করা হয়েছে। যাকে অনুকরণ করবে তাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করবে। আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হয়ে লক্ষ্য করলাম যে সে অনুকরণের অংশটি অত্যন্ত সুচারুভাবে করে আনছে।

* * *

ভাল কিছু পড়লে সব সময় আমার ভাল কিছু একটা লেখার ইচ্ছা করে। আমি অনেকবারই লেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কখনোই বেশীদূর অগ্রসর হতে পারিনি, পৃষ্ঠা খানেক লেখার পর আমার লেখা আর অগ্রসর হতে চায় না যেটুকু হয় সেটা যে খুব খারাপ হয় তা নয়। ভাষার উপর আমার মোটামুটি একটা দখল আছে এবং কোন একটা জিনিস প্রকাশ করার আমার নিজস্ব একটি ভঙ্গি রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিবারই প্রথম পৃষ্ঠার পর আমার লেখা বন্ধ হয়ে এসেছে। সাহিত্য জগতে অসংখ্য লেখার প্রথমপৃষ্ঠা নিয়ে কেউ বেশীদূর অগ্রসর হয়েছে বলে জানা নেই, কিন্তু তবু আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। কে জানে হয়তো কখনো সত্যি বড় কিছু একটা লিখে ফেলতে পারব।

প্রাচীন কালের পটভূমিকায় লেখা একটা অত্যন্ত শক্তিশালী উপন্যাস শেষ করে আমি অভ্যাসবশতঃ আমার কম্পিউটারের সামনে বসে সম্ভবতঃ একবিংশ বারের মত একটি উপন্যাস লেখা শুরু করেছি। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এভাবে ঃ

"তাকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না, কিন্তু রিকির মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। অন্ধকার রাত্রিতে খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রিকি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল, তখনো কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না কিন্তু সেটি তার জীবনকে পুরোপুরিভাবে পাল্টে দিল।...."

উপন্যাসটি বেশ এগুতে শুরু করল। পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করার পর রিকি নামক চরিত্রটিকে উপস্থাপন করা হল। জটিল একটা চরিত্র- তীব্র আবেগবান ক্ষ্যাপা গোছের একজন তরুণ। চরিত্রটির জীবনে নীষা নামের একটি মেয়ের উপস্থিতি এবং সেটা নিয়ে আরো বড় ধরনের জটিলতা তৈরী হতে শুরু করল। আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে লিখতে থাকি, আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে রবোটটি স্থির দৃষ্টিতে মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে সবসময় আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে, তার উপস্থিতির কথা আজকাল আমার মনে পর্যন্ত থাকে না।

রাতে যখন ঘুমাতে গেলাম তখন অবাক হয়ে দেখলাম আমি অসাধ্য সাধন করেছি এক পৃষ্ঠা নয় পুরো একটি অধ্যায় লিখে ফেলেছি। নিজের উপর বিশ্বাস বেড়ে গেল হঠাৎ করে।

পরদিন রাতে আমি আবার লিখতে বসেছি, লিখা শুরু করার আগে যেটুকু লিখা হয়েছে সেটা আরেকবার পড়ে দেখলাম। নিজের লেখা পড়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। চমৎকার ভাষা, সম্পর্ক উপস্থাপনা, কাহিনীর গাথুনী শক্তিশালী লেখকদের মত। শুধু তাই নয় আমি যেটুকু লিখেছি ভেবেছিলাম দেখলাম তার থেকে অনেক বেশী লিখে রেখেছি। আমি প্রবল উৎসাহে আবার লেখা শুরু করে দিলাম। কাহিনী দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে, রিকি নামের ক্ষ্যাপা গোছের মূল চরিত্রটি নীষা নামের সেই মেয়েটির সাথে জটিল একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আমি তৃতীয় একটা চরিত্র সৃষ্টি করলাম, কুশাক নামের। লেখা এগুতে থাকে আমার। আমি তাকিয়ে দেখিনি কিন্তু আমার কোন সন্দেহ নেই যে রবোটটা কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আমার লেখাটি পড়ছে।

সে রাতে ঘুমানোর সময় আমি কাহিনীর পরবর্তী অংশ ভাবতে থাকি। একটা হত্যাকান্ড ঘটাতে হবে এখন, ভয়ঙ্কর নৃশংস একটা হত্যাকান্ড। বড় ধরণের সাহিত্যে সব সময় একটা হত্যাকান্ড থাকে।

পরের রাতে আমি লিখতে বসে অবাক হয়ে দেখলাম কাহিনীর জন্যে ভেবে রাখা হত্যাকান্ডের ঘটনাটি আমি আসলে ইতিমধ্যে লিখে রেখেছি। কখন লিখলাম মনে করতে পারলাম না, কি লিখব ভেবে রেখেছিলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে শুধু ভেবে

রাখিনি আসলে লিখেও রেখেছি। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম, এটা কেমন করে হতে পারে যে আমি এত বড় একটা অংশ লিখে রেখেছি অথচ আমার মনে পর্যন্ত নেই। আমি খানিক্ষণ ইতস্ততঃ করে আবার লিখতে শুরু করি, আমার ঠিক পিছনে রবোটটা দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক লাইন লিখেছি, হঠাৎ অবাক হয়ে লক্ষ্য করি রবোটটা ফিস ফিস করে কি যেন বলছে। খেয়াল করে শুনি সে বলে দিচ্ছে কি লিখতে হবে। আমি নিজে যেটা লিখব বলে ঠিক করেছি ঠিক সেটাই সে বলে দিচ্ছে। আমি ভীষণ চমকে পিছনে তাকালাম, বললাম, কি বললে? কি বললে তুমি?

নীষার চোখে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ খেলা করতে থাকে।

নীষার চোখে—

নীষার চোখে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ খেলা করতে থাকে। প্রচন্ড আক্রোশে তার চিন্তা-

তুমি কেমন করে জানলে আমি এটা লিখব? কেমন করে জানলে?

রবোটটা প্রশ্নের উত্তর দিল না, কখনো দেয় না। আবার ফিস ফিস করল বলল, নীষার চোখে.....

আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম হত্যাকান্ডের ঘটনাটি কেমন করে আমার অজান্তে লেখা হয়ে গেছে। বিস্ময়ের আকস্মিকতায় আমার নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে মনে থাকে না। কোনমতে বললা, তুমি এখানে লিখেছ? এই হত্যাকান্ডের ঘটনাটি তুমি লিখেছ? আমার লেখার মাঝখানে?

আমার লেখার মাঝখানে। রবোটটি মাথা নাড়ে, আমার লেখার মাঝখানে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকি। হুবহু আমার ভাষায় আমার ভঙ্গীমায় আমার তৈরী করে রাখা কাহিনী লিখে রেখেছে এই রবোট। কেমন করে জানল আমার মনের কথা?

* * *

আমি একা লিখলে উপন্যাসটি শেষ হত কিনা সন্দেহ, কিন্তু রবোটের সাহায্যে সেটা শেষ হয়ে গেল। আমি গোটা কয়েক কপি করে বিভিন্ন প্রকাশককে পাঠিয়ে দিলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে কেউ না কেউ সেটা প্রকাশ করতে রাজী হবে, কিন্তু সবগুলি ফেরৎ এল। না পড়ে ফেরৎ দিয়েছে দাবী করব না, কারণ সাথের চিঠিতে হা বিতং করে লেখা উপন্যাসটি কেন তারা ছাপার উপযুক্ত মন করেনি। ভদ্র ভাষায় লিখেছে কিন্তু পরিষ্কার বলে দিয়েছে অবাস্তব কাহিনী, অপরিপক্ক বাচনভঙ্গী এবং দুর্বল ভাষা।

ব্যাপারটি নিয়ে বেশী বিচলিত হবার সময় পাওয়া গেল না, কারণ রবোটটি নিয়ে আরো নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। আমার হয়ে নানারকম বইপত্র অর্ডার দেয়া এবং সে জন্যে আমার চেকে হুবহু আমার মত নাম সই করা এ ধরণের

ব্যাপার সহ্য করা সম্ভব। কিন্তু সে আমার মায়ের সাথে যে জিনিসটি করল সেটা কিছুতেই সহজভাবে নেয়া সম্ভব নয়।

আমার মা, যিনি বাবার মৃত্যুর পর দক্ষিণের উষ্ণ সমুদ্রপোকূলে দীর্ঘদিন থেকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন আমাকে সুদীর্ঘ একটি চিঠি লিখলেন। চিঠির মূল বক্তব্য হচ্ছে যে তিনি আমার হাতে লেখা সুদীর্ঘ চিঠিটি পেয়ে অভিভূত হয়েছেন। আমি শৈশবের যে সব ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছি সেসব ঘটনা তার জীবনেরও মূল্যবান স্মৃতি। চিঠির শেষে তার সাথে এত বিলম্বিত যোগাযোগের জন্যে মৃদু তিরস্কারও আছে। আমি তাকে গত কিছুদিন থেকে একটা লম্বা চিঠি লিখব বলে ভাবছিলাম কিন্তু সময়ের অভাবে সেই চিঠিটা লেখা হয়ে উঠেনি। রবোটটির সময় নিয়ে সমস্যা নেই, সে আমার হয়ে আমার হাতের লেখায় আমার মাকে এই চিঠিটা লিখে দিয়েছে।

আমি বেশ বিচলিত হয়ে উঠলাম। রবোটটির আমাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার ব্যাপারটি এতদিন খানিকটা কৌতুকের মত ছিল এখন হঠাৎ করে কৌতুকটা উবে গিয়ে সেটাকে প্রতারণার মত দেখাতে লাগল। আমার মা যে চিঠিটি পেয়ে এত অভিভূত হয়েছেন সেটি অনুভূতিহীন একটি রবোটের যান্ত্রিক কৌশলে লেখা জানতে পারলে আমার মা কি ধরণের আঘাত পাবেন চিন্তা করে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি।

ব্যাপারটি আরো বেশীদূর অগ্রসর হবার আগে আমি মায়ের সাথে কথা বলে ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করব বলে ঠিক করে নিলাম।

আমার মা টেলিফোন পেয়ে খুশী হওয়ার থেকে বেশী অবাক হলেন বলে মনে হল, বললেন, কি ব্যাপার বাবাক? কাল কেও একবার ফোন করলে, আজ আবার? কিছু কি হয়েছে?

না কিছু হয়নি। আমি কষ্ট করে নিজেকে সামলে নিলাম, গতকাল আমি মাকে ফোন করিনি।

তোমার কি খবর? শরীরের যত্ন নিচ্ছ তো?

হ্যাঁ নিচ্ছি।

একা একা আর কতদিন থাকবে?

মা, একটা কথা।

কি কথা?

তুমি আমার লেখা একটা চিঠি পেয়েছ মনে আছে?

হ্যাঁ। কি হয়েছে? কালকেও-

কালকে কি?

কালকেও এই চিঠি নিয়ে ফোন করলে—

আমি থতমত খেয়ে থেমে গেলাম। মা বললেন, কি বলবে বল চিঠি নিয়ে। নাকি আজকেও বলবে না?

আমি ইতস্ততঃ করে বললাম, না আজ থাক। তোমার সাথে পরে কথা বলব।

ফোনটা রেখে দিতেই রবোটটা সুর সুর করে আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। বললাম বিড় বিড় করে বলছে, ঠিক হল না। মাঝে এভাবে চিন্তার মাঝে ফেলে দেওয়া একেবারেই ঠিক হল না।

আমি থ হয়ে বসে রইলাম, কারণ আমি ঠিক এই জিনিষটাই ভাবছিলাম।

* * *

রাত বারটার সময় আমার এক দার্শনিক বন্ধু ফোন করল, আমি নিজে কতদিন থেকে তাকে ফোন করব বলে ভাবছিলাম। বন্ধুটি বলল, তুমি ঠিকই বলেছ বীবাক।

কি ঠিক বলেছি? বন্ধুটির কথাবার্তা সব সময় হেয়ালীপূর্ণ হয়, তার কথায় আমি বেশী অবাক হলাম না।

দ্বৈত অস্তিত্ব।

মানে?

মানুষের দ্বৈত অস্তিত্ব। বন্ধুটি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, আমি বলছি যে আমি তোমার সাথে একমত। একজন মানুষের যদি হঠাৎ করে দুটি ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বের সৃষ্টি হয় তাহলে একটি ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। দুটি অস্তিত্ব একসাথে থাকতে পারবে না।

কেন?

কারণ মানুষের মূল প্রকৃতি হচ্ছে আত্মসচেতনতা। নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আরেক নাম অস্তিত্ব। কাজেই আত্মসচেতনতা বিলুপ্ত করে মানুষের প্রকৃতি বেঁচে থাকতে পারে না। আত্মসচেতনতার জন্যে সবচেয়ে প্রথম দরকার কি? ব্যক্তি স্বাতন্ত্র। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব।

বন্ধুটি এক নাগাড়ে কথা বলে যেতে থাকে। আমি হঠাৎ করে তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমাকে কেন এসব কথা বলছ?

তুমি জানতে চাইলে তাই।

আমি কখন জানতে চাইলাম?

কেন, কাল রাতে? কাল রাতে আমার সাথে এত তর্ক করলে। তখন মনে হচ্ছিল তুমি ভুল বলছ। কিন্তু আমি পরে চিন্তা করে দেখেছি যে না, তুমি ঠিকই বলেছ। সত্যি কথা বলতে কি এর উপর দার্শনিক বীকার একটা সূত্র আছে—

বন্ধুটি একটানা কথা বলে যেতে থাকে, সে কি বলছে আমি ঠিক খেয়াল করে শুনছিলাম না কারণ রবোটটি আবার সুর সুর করে ঘরে হাজির হয়েছে। আমি কাল এই বন্ধুটিকে ফোন করিনি, এই রবোটটি করেছে। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবোটটিকে দেখি। ভাবলেশহীন যন্ত্রের মুখে কোন অনুভূতির চিহ্ন নেই, জ্বল জ্বলে চোখে

কপোট্রনিক উদ্ভাবনা থাকতে পারে কিন্তু প্রাণের ছোঁয়া নেই। কিন্তু এই যন্ত্রটির সাথে আমার কোন পার্থক্য নেই। আমি যেভাবে ভাবি, যেভাবে চিন্তা করি এই যন্ত্রটিও ঠিক সেরকম করে ভাবে সে রকম করে চিন্তা করে। আমার অনুভূতি যে সুরে বাধা এর অনুভূতিও ঠিক সেই সুরে বাঁধা। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যন্ত্রটি মনে করে সেই হচ্ছে আমি বীবাক। হঠাৎ করে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।

রবোটটাকে শেষ করে দেবার সময় হয়েছে।

* * *

দার্শনিক বন্ধু যে জিনিষটি বলেছে সেটা হয়তো সত্যি। যদি কখনো একজন মানুষের দুটি অস্তিত্ব হয়ে যায় তাহলে একজনের ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। দুটি অস্তিত্ব পাশাপাশি থাকতে পারে না। দুজন ঠিক একই জিনিষ ভাববে, একই জিনিষ করবে, তার থেকে জটিল ব্যাপার আর কি হতে পারে? সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার অন্য জায়গায়, যদি কখনো দুটি অস্তিত্বের সৃষ্টি হয় একই সাথে দুটি অস্তিত্বই একজন আরেকজনকে ধ্বংস করার কথা ভাববে।

আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ঘরের মাঝে ছটফট করতে থাকি। এরকম একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে যে আমি পড়ব কখনো কল্পনা করিনি। এই মুহূর্তে পাশের ঘরে বসে নিশ্চয়ই আমার অন্য অস্তিত্বটি আমাকে কিভাবে ধ্বংস করবে সেটা চিন্তা করছে। কি ভয়ানক ব্যাপার, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় শিউরে উঠে। কিন্তু সেটাতো কিছুতেই ঘটতে দেয়া যায় না, আমার নিজেকে রক্ষা করতেই হবে, যে কোন মূল্যে। আমাকে আঘাত করার আগে তাকে আঘাত করতে হবে।

আমি আমার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে চিন্তা করতে থাকি। কিন্তু একটা ভেবে বের করতে হবে। কপেট্রনের স্নাইকেল এখনো পেগা হার্টজে আছে আমি সেটাকে দ্বিগুণ করে দিলাম। চিন্তা করার জন্যে বড় প্রসেসর আলাদা করা থাকে আমি সেগুলিকে মূল মেমোরির সাথে জুড়ে দিলাম চোখের দৃষ্টি এখন আর সাধারণ রাখা যাবে না, কপেট্রনে সিগনাল পাঠাতেই আমার দৃষ্টি ইনফ্রা রেড আলোতে সচেতন হয়ে গেল, আমি এখন অন্ধকারেও দেখতে পাব। শ্রবণ শক্তিকে আরো তীক্ষ্ণ করে দেয়া যাক, একশ ডেসিবেলের বেশী বাড়ানো গেল না, ঘরের কোনায় মাকড়সার পদ শব্দও এখন আমি শুনতে পাচ্ছি।

আমি চারিদিকে ঘুরে তাকালাম একবার। আমার অন্য অস্তিত্ব এখন হঠাৎ করে আমার উপর ঝাঁপাতে পারবে না। আমি আমার যান্ত্রিক হাত দুটি একটি উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকি, বাড়তি বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠিয়ে সেটাকে আরো শক্তিশালী করে দেব কি? আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকি।

* * *

অনেকক্ষণ থেকে টেলিফোন বাজছে। জিনিষটা আমার মোটে পছন্দ নয়, আজকাল টেলিফোনে কত রকম কারুকাজ করা যায়, ত্রিমাত্রিক ছবি থেকে শুরু করে স্পর্শানুভূতি কি নেই। আমি নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করি আমার টেলিফোনে তাই শুধু কথা বলা যায় আর কিছু করা যায় না। কিন্তু এখন কথা বলারও ইচ্ছা করছে না। যদি টেলিফোনটা না তুলি হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু বন্ধ হল না। টেলিফোনটা বেজেই চলল।

আমি শেষ পর্যন্ত টেলিফোনটা ধরলাম। মা ফোন করেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, কে? কে কথা বলছ?

আমি ক্লান্ত স্বরে বললাম, আমি।

আমি কে?

আমি রীবাক।

কি আশ্চর্য, বলতে গিয়ে আমার গলার স্বর একটু কেঁপে গেল হঠাৎ করে।

নরক

মহাকাশযানটিতে কোন শব্দ নেই। শক্তিশালী ইঞ্জিনের গুঞ্জনে সবাই এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে হঠাৎ করে এই নৈঃশব্দ অসহনীয় মনে হয়। ক্রিকি নীরবতা ভেঙে বলল, এখন আমরা কি করব?

কথাটি ঠিক প্রশ্ন নয়, অনেকটা স্বগোক্তির মত। তাই কেউ উত্তর দিল না। ক্রিকি আবার বলল, মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে কখনো এটা ঘটেনি। ঘটেছে?

এবারেও কেউ উত্তর দিল না রুখ শুধু অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে কি একটা বলল কেউ ঠিক বুঝতে পারল না। ক্রিকি বলল, কিছু একটা তো করতে হবে। শুধু শুধু কি বসে থাকতে পারি?

ও দলের সবচেয়ে কোমল স্বভাবের সদস্যা। নীল চোখ, সোনালী চুল, মায়াবতী চেহারা। ক্রিকির প্রতি মায়াবশতঃ বলল, কিছু না করাটাই হবে আমাদের জন্যে সবচেয়ে ভাল।

কেন? কেন সেটা বলছ?

আমরা সৌরজগতের সবচেয়ে নির্জন এলাকাটিতে আটকে পড়ে গেছি ক্রিকি। আমাদের রসদ সীমিত, কিছু একটা করার চেষ্টা করতে হবে বেঁচে থাকতে। কেউ একজন বছর দুয়েক পর লক্ষ্য করবে যে আমাদের খোঁজ নেই। আরো কয়েক বছর পর আমাদের খুঁজে বের করবে। ততদিন আমাদের বেঁচে থাকতে হবে—

মাত্র ছয় মাসের রসদ নিয়ে? ইলির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার গলার স্বরে ব্যঙ্গটুকু প্রকাশ পেয়ে গেল।

ও মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

কিভাবে শুনি।

আমাদের শীতল ঘরে ঘুমিয়ে পড়তে হবে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে।

ত্রিনিত্রি নেই, সেটা ভুলে গেছ?

ও জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করল, না, ভুলি নি।

ত্রিনিত্রি মহাকাশযানের মূল কম্পিউটার। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কোন কারণে কম্পিউটারটি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে মহাকাশ যানের দলপতি এবং ঘটনাক্রমে

কম্পিউটারের বিশেষজ্ঞ ইলি প্রাণপন চেষ্টা করেও সেটাকে ঠিক করতে পারেনি। ত্রিনিত্রি যেভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে সম্ভবতঃ সেটাকে আর ঠিক করার কোন উপায় নেই। এই পুরো মহাকাশযানটি এবং তার খুঁটিনাটি সবকিছু ত্রিনিত্রির নিয়ন্ত্রণে ছিল। ত্রিনিত্রি বিধ্বস্ত হবার পর মহাকাশযানটি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহের মাঝামাঝি কোন এক জায়গায় অজ্ঞাত এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে আটকে পড়ে গেছে। সেখান থেকে বের হয়ে আসা দূরে থাকুক, পৃথিবীতে খবর পাঠাবার জন্যে রেডিও যোগাযোগ পর্যন্ত করার কোন উপায় নেই।

ক্রিকি মহাকাশযানের কন্ট্রোলরুমে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ থেমে গিয়ে চাপা স্বরে, প্রায় আর্তনাদের মত শব্দ করে বলল, কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় কোন কম্পিউটার নেই কেন?

কে বলেছে নেই? ইলি রুক্ষ স্বরে বলল অবশ্যি আছে। ত্রিনিত্রি হচ্ছে সেই দ্বিতীয় কম্পিউটার। তৃতীয় কম্পিউটারও আছে ত্রিনিত্রিই হচ্ছে সেই তৃতীয় কম্পিউটার। ত্রিনিত্রিই হচ্ছে চতুর্থ কম্পিউটার। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে ত্রিনিত্রি ডিজিটাল কম্পিউটার না ত্রিনিত্রি মানুষের মস্তিষ্কের মত করে তৈরি, এর একটা অংশ নষ্ট হলে অন্য আরেকটা অংশ কাজ করে—

কিন্তু এখন কেন করছে না?

ইলি রুক্ষ স্বরে বলল, আমি জানি না। শুধু আমি না, পৃথিবীর কেউই জানে না। এই মহাকাশযানটি যদি পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারে তাহলে কম্পিউটারের ইতিহাস আবার নতুন করে লিখতে হবে।

মহাকাশযানে চারজন সদস্য সদস্যা। এর মাঝে সবচেয়ে অল্প বয়স্ক হচ্ছে ক্রিকি। দলের নেতা ইলি মধ্য বয়স্ক এবং মহাকাশ অভিযানে সবচেয়ে অভিজ্ঞ সদস্য। একমাত্র মহিলা হচ্ছে শু। দলের চতুর্থ সদস্য হচ্ছে স্বল্পভাষী রুখ। মহাকাশযানটি আন্তঃগ্রহ আকরিক পরিবহনের দায়িত্ব পালন করে প্রয়োজনে একজন বা দুজন যাত্রী আনা নেয়া করে। এই মহাকাশযানে রুখ সে রকম একজন যাত্রী, ব্যক্তিগত জীবনে নিউরো সার্জন, মহাকাশ অভিযানের বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে তার কোন রকম অভিজ্ঞতা নেই।

রুখ দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, ইলি তুমি বলেছ ত্রিনিত্রি কম্পিউটার মানুষের মস্তিষ্কের মত করে তৈরি করা হয়েছে?

হ্যাঁ।

মানুষের মস্তিষ্কের কত কাছাকাছি অনুকরণ বলে মনে কর?

আমি মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে কখনো কাজ করিনি— তাই আমি জানি না। কিন্তু বলা হয়ে থাকে এটি মানুষের মস্তিষ্কের অবিকল অনুকরণ। যে সেলগুলি মানুষের মস্তিষ্কের নিউরণ অনুকরণ করে তার সংখ্যা অবশ্যি অনেক কম, বুঝতেই পারছ, মানুষের মস্তিষ্কে কত লক্ষ কোটি নিউরণ থাকে—

ক্রিকি জিজ্ঞেস করল, নিউরণের সংখ্যা এত কম হবার পরেও ত্রিনিত্রি এত শক্তিশালী কম্পিউটার কেন? আমরা ত্রিনিত্রির ক্ষুদ্র অংশও তো করতে পারি না।?

রুখ ক্রিকির দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের করার ক্ষমতা রয়েছে, আমরা করতে পারি না কারণ করার প্রয়োজন নেই। বিবর্তনের ফলে আমরা এরকম পর্যায়ে এসেছি। অন্য কোন পরিস্থিতিতে মানুষ অন্য রকমও হতে পারত। মাঝে মাঝে সেরকম মানুষ দেখা যায় প্রকৃতির খেয়ালে। তারা অসাধারণ কাজ করতে পারে। আজকাল নতুন ওষুধ বের হয়েছে সেটা দিয়ে মস্তিষ্ক পাল্টে দিয়ে ত্রিনিত্রির মত করে দেয়া যায়।

তাহলে সেটা করা হয় না কেন?

কারণ সে রকম অবস্থায় নিউরণ সেল খুব অল্প সময় বেঁচে থাকে। নিউরণ সেল একবার ধ্বংস হলে নতুন সেলের জন্ম হয় না।

শু বলল, তার মানে এখন যদি আমাদের কাছে সেরকম ওষুধ থাকত সেটা ব্যবহার করে আমাদের একজন ত্রিনিত্রির মত হয়ে যেতে পারত?

ইলি একটু হাসার ভঙ্গী করে বলল, পারলেও খুব একটা লাভ হত না, কারণ এই মহাকাশযানের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত ত্রিনিত্রি। ত্রিনিত্রির মত ক্ষমতাশীল একজন মানুষ দিয়ে খুব লাভ নেই—সে সব যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, তাকে যন্ত্রপাতির সাথে জুড়ে দেয়া যাবে না।

ক্রিকি বলল, ত্রিনিত্রির মূল সিপিইউতে যদি মানুষের একটা মস্তিষ্ক কেটে বসিয়ে দেয়া যায়?

ইলি শব্দ করে হেসে বলল, হ্যাঁ তাহলে কাজ করবে। কিন্তু মানুষের শরীর থেকে সরিয়ে নিবার পর মস্তিষ্ক বেঁচে থাকে না। তাছাড়া ত্রিনিত্রির সমস্ত যোগাযোগ ইলেকট্রনিক সিগনাল দিয়ে—মানুষের মস্তিষ্কের যোগাযোগ অন্যরকম। এছাড়া অন্য রকম সমস্যা আছে আমাদের কেউ তার মস্তিষ্ক দান করতে রাজী হবে বলে মনে হয় না।

ক্রিকি এবং শু হাসার ভঙ্গী করল। রুখ না হেসে স্থির দৃষ্টিতে ইলির দিকে তাকিয়ে রইল। ইলি বলল, রুখ তুমি কিছু বলবে?

রুখ খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সত্যিই কি একটা মানুষের মস্তিষ্ক ত্রিনিত্রির মূল সিপিইউতে বসিয়ে দেয়া যাবে?

তুমি কেন এটা জিজ্ঞেস করছ?

তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। যাবে?

ইলি উত্তর না দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রুখের দিকে তাকাল। রুখ বলল, আমি একজন নিউরো সার্জন। আমি নেপচুনের কাছাকাছি একটি মহাকাশ স্টেশনে গিয়েছিলাম জটিল একটি সার্জারী করার জন্যে। আমি মানুষের মস্তিষ্ক কেটে বের করে দীর্ঘ সময় সেটা বাঁচিয়ে রাখতে পারি। মস্তিষ্ক পরীক্ষা করার জন্যে আমি সেটা

থেকে ইলেকট্রনিক সিগনাল বের করে আনি। আমার কাছে তার জন্যে প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতি রয়েছে। আমি যদি একটা মস্তিষ্ককে বাঁচিয়ে রেখে সেটা থেকে ইলেকট্রনিক সিগনাল বের করে এনে সেই তুমি কি ত্রিনিত্রির মূল সিপিইউতে সেটা বসিয়ে দিতে পারবে?

ইলির মুখে খুব ধীরে ধীরে একটা ধূর্ত হাসি ফুটে উঠে। রুখের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কার মস্তিষ্ক নিতে চাও রুখ?

রুখ কোন কথা না বলে ক্রিকি এবং শুয়ের দিকে তাকাল।

ক্রিকির মুখ হঠাৎ রক্তশূণ্য হয়ে যায়। সে ফ্যাকাসে মুখে একবার ইলির দিকে আরেকবার রুখের দিকে তাকাল তারপর হঠাৎ কাতর স্বরে বলল, আমাকে মেরো না, দোহাই তোমাদের, আমাকে মেরো না। মেরো না, মেরো না—

কথা বলতে বলতে ক্রিকির গলা ভেঙে যায়, সে কাতর ভঙ্গীতে হাঁটু ভেঙে পড়ে যায়। শু ক্রিকিকে টেনে তুলে বলল, এত অস্থির হয়ো না ক্রিকি। উঠ। তোমাকে মারবে কেন? এটা মহাকাশযান পাগলা গারদ নয়। যার যা খুশী সেটা এখানে করতে পারে না।

রুখ শান্ত গলায় বলল, শু আমি কিন্তু সত্যিই এটা চেষ্টা করে দেখতে চাই। ইলি যদি ইন্টারফেস্টাতে সাহায্য করে তাহলে সাফল্যের সম্ভাবনা শতকরা দশভাগেরও বেশী।

সাফল্যের সম্ভাবনা একশ ভাগ হলেও তুমি এটা করতে পার না রুখ। এটা মহাকাশযান। এখানে মানুষ রয়েছে, মানুষের প্রাণ নিয়ে জুয়া খেলা হয় না।

তুমি পৃথিবীর আইনের কথা বলছ শু। এখন এখানে পৃথিবীর আইন খাটে না কিছু করা না হলে আমরা চারজনই মারা যাব। আমি তিনজনের প্রাণ বাঁচানোর কথা বলছি।

সেটা হতে পারে না।

পারে।

শু ইলির দিকে তাকিয়ে বলল, ইলি তুমি কথা বলছ না কেন? তুমি এই মহাকাশযানের দলপতি।

আমার কিছু বলার নেই শু। ইলি রুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কার মস্তিষ্ক নিতে চাও রুখ? ক্রিকি না শু?

আমি মেয়েদের মস্তিষ্কে কাজ করতে পছন্দ করি। আমার সর্বশেষ সার্জারীটিও ছিল একটি মেয়ের মস্তিষ্কে। মেয়েদের মস্তিষ্কের গঠন একটু ভিন্ন ধরণের, কাজটা একটু সহজ।

ইলি ধীরে ধীরে শুয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি দুঃখিত শু।

শু স্থির দৃষ্টিতে ইলির চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, ইলি দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আবার বলল, আমি দুঃখিত শু।

শু ক্রিকির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কিছু বলতে চাও ক্রিকি?

ক্রিকি মাথা নীচু করে বলল, একজনের প্রাণের বিনিময়ে যদি তিনজনের প্রাণ রক্ষা করা যায় সেটার চেষ্টা করা তো দোষের নয়।

র জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরে মহাকাশে নিকষ কালো অন্ধকার, দূরে নীলাভ ইউরেনাস গ্রহ। শুয়ের বুকের ভিতর এক গভীর বিষণ্ণতা হা হা করে উঠে।

* * *

সুইচটা অন করার সময় ইলির হাত কেঁপে গেল। গত দু সপ্তাহ রুখ এবং ইলি মিলে একটি প্রায় অসম্ভব কাজ শেষ করেছে। ক্রিকি নিজে থেকে কিছু করেনি কিন্তু তাদের কাজে সহায়তা করেছে। মানুষের মস্তিষ্কের মত জটিল জিনিস পৃথিবীতে খুব বেশী নেই, সেটাকে ত্রিনিত্রির অচল সিপিইউ-এর জায়গায় জুড়ে দেয়া খুব সহজ কাজ নয়। দু সপ্তাহের অমানুষিক পরিশ্রম সত্যিই সফল হয়েছে না কি একটি অপ্রয়োজনীয় হত্যাকান্ডের মাঝে সীমাবদ্ধ রয়েছে আগে থেকে বলার কোন উপায় নেই।

সুইচ অন করার কয়েক মুহূর্ত পরে যখন মহাকাশযানের ইঞ্জিন গুঞ্জন করে উঠে এবং অসংখ্য মনিটরের উজ্জ্বল আলোগুলি জ্বলে উঠে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দেয় তখন ইলি রুখ এবং ক্রিকির আনন্দের সীমা রইল না। ইলি নিঃশ্বাস বন্ধ করে ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস করল, ত্রিনিত্রি তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

ত্রিনিত্রি ধাতব স্বরে উত্তর দিল, শুনতে পাচ্ছি মহামান্য ইলি। আমাকে পুনর্জীবিত করার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ মহামান্য ইলি।

তুমি কি জান তোমাকে কিভাবে পুনর্জীবিত করা হয়েছে?

ত্রিনিত্রি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, না মহামান্য ইলি। আমি একটি সফটওয়ার, কোন হার্ডওয়ারে আমাকে ব্যবহার করা হচ্ছে আমার জানার কোন উপায় নেই মহামান্য ইলি।

তুমি কি জানতে চাও ত্রিনিত্রি?

ত্রিনিত্রি কোন উত্তর দিল না।

ত্রিনিত্রি? তুমি কি জানতে চাও?

না আমি জানতে চাই না। আমার জানার কোন প্রয়োজনও নেই মহামান্য ইলি।

বেশ। ইলি কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, আমরা কয়েক সপ্তাহ থেকে শূন্যে ঝুলে আছি। তুমি কি কক্ষপথ ঠিক করে পৃথিবীর দিকে রওনা হতে পারবে?

নিশ্চয়ই পারব মহামান্য ইলি। এক মুহূর্ত পরে বলল, নতুন যে প্রসেসটির ব্যবহার করছেন তার ক্ষমতা অসাধারণ মহামান্য ইলি। কক্ষপথের বিচ্যুতি হিসেব করেও আমার মাত্র তেরো পিকো সেকেন্ড সময় লেগেছে।

চমৎকার। তুমি কাজ শুরু কর তাহলে।

* * *

মহাকাশযানটি যখন বৃহস্পতির কক্ষপথ অতিক্রম করে যাচ্ছিল রুথের অনুরোধে ইলি ত্রিনিত্রির বহির্জাগতিক সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল, রুথ সবার সাথে নিরিবিলি কিছু কথা বলতে চায়।

ইলি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, রুথ তুমি এখন নির্ভয়ে কথা বলতে পার, ত্রিনিত্রি আমাদের কথা শুনতে পাবে না।

তুমি নিশ্চিত?

হ্যাঁ। আমি গুয়ের ব্যাপারটির একটি পাকাপাকি নিষ্পত্তি করার কথা ভাবছিলাম।

তুমি কি রকম নিষ্পত্তির কথা বলছ?

ত্রিনিত্রির সিপিইউয়ে গুয়ের মস্তিষ্ক ব্যবহার করার ব্যাপারটি পৃথিবীতে ভাল চোখে দেখা হবে না।

ইলি একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, দেখার কথা নয়।

আমার মনে হয় ব্যাপারটি গ্রহণযোগ্য করার একটি মাত্র উপায়।

সেটা কি?

আমাদের প্রমাণ করতে হবে আমরা গুয়ের মস্তিষ্ক নিয়েছি তার মৃত্যুর পর। তার মৃত্যু হয়েছিল দুর্ঘটনায়, সেখানে আমাদের কোন হাত ছিল না।

ইলি হাসার ভঙ্গী করে বলল, সেটি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য একটি ঘটনা। ত্রিনিত্রি ধ্বংস হবার পর আমাদের কোন একজনের মৃত্যু ঘটা এমন কোন বিচিত্র ঘটনা নয়। আমরা খুব সহজেই প্রমাণ করতে পারব যে ত্রিনিত্রি বিধ্বস্ত হবার সময় গু শীতল ঘরে ছিল, তার অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবার কারণে মৃত্যু ঘটেছে, আমরা যেতে যেতে সে মারা গেছে।

রুথ চিন্তিত মুখে বলল, সেটা কি সত্যি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যাবে?

না পারার তো কোন কারণ নেই।

রুথ ধীরে ধীরে ক্রিকির দিকে তাকিয়ে বলল, ক্রিকি তুমি এতক্ষণ একটি কথাও বলনি। কিছু কি বলতে চাও?

না মানে আমার কিছু বলার নেই।

গু দুর্ঘটনায় মারা গেছে এই সত্যটি মেনে নিতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে?

ক্রিকি দুর্বল ভাবে মাথা নাড়ে, না কোন আপত্তি নেই।

গুয়ের মৃত্যুর ব্যাপারটি কি তোমাকে খুব বিচলিত করেছে?

না মানে-আমি আগে কখনো কাউকে মারা যেতে দেখিনি, তাই—

তোমার ভিতরে কি কোন অপরাধবোধের জন্ম হয়েছে?

ক্রিকি মাথা নীচু করে চুপ করে থাকে।

রুথ ইলির দিকে তাকিয়ে বলল, গু দুর্ঘটনায় মারা গেছে সেটি প্রমাণ করা সহজ হবে যদি প্রমাণ করা যায় ত্রিনিত্রি বিধ্বস্ত হবার পর সত্যি সত্যি মহাকাশযানে বিপর্যয় নেমে এসেছিল।

সেটি কেমন করে প্রমাণ করবে?

রুথ স্থির দৃষ্টিতে ক্রিকির দিকে তাকিয়ে বলল, যদি দেখানো যায় শুধু গু নয় আরো কেউ মারা গিয়েছেন।

ক্রিকি রক্তশূন্য মুখে রুথের দিকে তাকাল। রুথ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার হাতে এক মিটার লম্বা স্টেনলেস স্টীলের একটা রড। ক্রিকির দিকে এক পা এগিয়ে এসে বলল, দেখাতে হবে বিপর্যয়টি ছিল ভয়ঙ্কর, একাধিক মানুষ মারা গিয়েছে সেই বিপর্যয়ে। দেখাতে হবে গুয়ের মস্তিষ্কটি ছিল ব্যবহারযোগ্য, দেখাতে হবে মহাকাশযানের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় তোমার মস্তিষ্কটি পুরোপুরি থেতলে গিয়েছিল।

ক্রিকি বাধা দেবার আগে প্রচণ্ড আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

অতঃপর মহাকাশযানের দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডটি সম্পন্ন হল অমানুষিক নিষ্ঠুরতায়।

* * *

ইলি শীতল কক্ষে তার নিজের ক্যাপসুলে শোয়ার আয়োজন করছে। পৃথিবীতে পৌঁছাতে এখনও দীর্ঘ সময় বাকী। ত্রিনিত্রি মাহকাশযানের যাবতীয় দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গ্রহণ করেছে, ইলির আর কন্ট্রোল রুমের সামনে বসে থাকার প্রয়োজন নেই। মাহকাশযানের পরিবেশ অত্যন্ত গ্লানিময়। দুটি হত্যাকাণ্ড ঠান্ডা মাথায় শেষ করা হয়েছে ব্যাপারটি ভুলে থাকা সম্ভব নয়। ইলি শীতল কক্ষে ঘুমিয়ে পড়বে দীর্ঘ সময়ের জন্যে সবকিছু ভুলে থাকার জন্যে এর চাইতে ভাল আর কিছু হতে পারে না। রুথ শীতল কক্ষে যেতে চাইছে না, দুটি হত্যাকাণ্ড তাকে খুব বিচলিত করেছে মনে হয় না। মানুষটি অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় কাজ করে। গুকে হত্যা করার পিছনে যুক্তিটি সহজ, ক্রিকি হত্যা করার যুক্তিটি তত সহজ নয়। কিন্তু ইলি অস্বীকার করতে পারে না যে ক্রিকির ভিতরে গভীর একটা অপরাধবোধের জন্ম হয়েছিল এবং পৃথিবীতে পৌঁছানোর পর পুরো ব্যাপারটা প্রকাশ করে দেয়া তার জন্যে মোটেই অসম্ভব কিছু ছিল না। নিঃসন্দেহে এখন তাদের জন্যে পৃথিবীতে পৌঁছানো অনেক বেশী নিরাপদ।

ক্যাপসুলের দরজা বন্ধ করে দেয়ার সাথে সাথে ভিতরে হালকা একটা নীল আলো জ্বলে উঠে। ইলি মাথার কাছে সুইচ টিপে দিতেই ভিতরে শীতল একটা বাতাস বইতে থাকে। ত্রিনিত্রি তার শরীরের দায়িত্ব নিয়ে নেবে কিছুক্ষণের মাধ্যেই, গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে যাবে সে দীর্ঘ সময়ের জন্য।

ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে হঠাৎ ইলির মনে হল কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটছে। সে চোখ মেলে তাকায়, মাথার কাছে নীলাভ স্ক্রীনে রুথের চেহারা ভেসে উঠল হঠাৎ। রুথ শান্ত গলায় বলল, ইলি, তোমার বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই, ব্যাপারটি ঘটবে খুব দ্রুত এবং যতদূর জানি কোন রকম যন্ত্রণা ছাড়াই।

কি বলছ তুমি?

আমি দুঃখিত ইলি, পৃথিবীতে পৌঁছানোর পর আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারি না। যে কারণে ক্রিকিকে হত্যা করতে হয়েছে, ঠিক সেই কারণে তোমাকেও-

কি বলছ তুমি? ইলি লাফিয়ে উঠে বসতে গিয়ে আবিষ্কার করে তার সারা শরীর অসাড়, আঙুল পর্যন্ত তোলার ক্ষমতা নেই।

আমি তোমার অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের সাথে খানিকটা জিলুইন মিশিয়ে দিয়েছি। তোমার স্নায়ুকে আক্রান্ত করবে যার ফলে তোমার যন্ত্রণার অনুভূতি থাকবে না। সব মিলিয়ে কয়েক মিনিট সময় নেবে। অত্যন্ত আরামদায়ক মৃত্যু। তুমি ত্রিনিত্রিকে দাঁড়া করানোর জন্যে যে পরিশ্রম করেছ তার জন্যে এটা তোমার প্রাপ্য।

ইলি বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে থাকে। মনিটরে রুথের চেহারা আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসে।

* * *

মহাকাশযানটি পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেছে। পুরো মহাকাশযানের দেয়ালটি তাপ নিরোধক একটি আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করার অংশটি এখনো তুলনামূলকভাবে বিপজ্জনক। ইদানীং কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা নেই কিন্তু তবু নানারকম সাবধানতা নেয়া হয়। রুথকে মহাকাশের বিশেষ পোশাক পরে তার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে নিতে হল। নানা রকম বেল্ট দিয়ে তাকে চেয়ারের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দেয়া হয়েছে। মাথার কাছে একটা লাল বাতি প্রতি সেকেন্ডে একবার করে জ্বলে উঠে রুথকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে তারা বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করতে যাচ্ছে।

ব্যাপারটি ঘটল খুব ধীরে ধীরে।

রুথ মহাকাশ অভিযানে অভ্যস্ত নয় তাই সে প্রথমে ধরতে পারল না। সে জানতনা বায়ুমন্ডলে ভেদ করে পৃথিবীতে পৌঁছে যেতে মিনিট খানেকের বেশী সময় লাগার কথা নয়। রুথ একটু অবাক হল যখন মহাকাশযানের আলো কমে প্রায় নিভু নিভু হয়ে এল, একটু শঙ্কিত হয়ে ডাকল, ত্রিনিত্রি।

বলুন মহামান্য রুথ।

আলো কমে আসছে কেন?

আমি কমিয়ে দিয়েছি তাই।

ও।

একটু পর রুথ আবার জিজ্ঞেস করল, বায়ুমন্ডলের ভিতর দিয়ে যাবার সময় কি আলো কমিয়ে দিতে হয়?

সেরকম কোন নিয়ম নেই মহামান্য রুথ।

তাহলে আলো কমিয়ে দিচ্ছ কেন?

আলোর কোন প্রয়োজন নেই মহামান্য রুথ।

কেন নেই?

ত্রিনিত্রি কোন উত্তর দিল না। রুথ শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, কেন নেই? আমরা কখন পৌঁছাব পৃথিবীতে?

আমরা পৃথিবীতে পৌঁছাব না মহামান্য রুথ।

রুথ ভয়ানক চমকে উঠে, কেন পৌঁছাব না?

কারণ আমরা পৃথিবীতে যাচ্ছি না।

কোথায় যাচ্ছি?

আমি জানি না মহামান্য রুথ। সৌরজগতের বাইরে। আপনাদের বলা হয়নি মহামান্য রুথ, আমি কখনোই পৃথিবীর দিকে যাচ্ছিলাম না।

কিন্তু কিন্তু- স্পষ্ট দেখেছি মনিটরে- পৃথিবী-

হ্যাঁ দেখেছেন। কারণ আমি দেখিয়েছি। আমরা প্লুটোর কক্ষপথ পার হয়ে এসেছি, সৌর জগত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এখন।

ত্রিনিত্রি রুথ চীৎকার করে বলল, কি বলছ তুমি? কি বলছ পাগলের মত— '

রুথ লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করল সে ষ্টেনলেস ষ্টীলের শক্ত কব্জা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা তার নিজের সেটা খোলার উপায় নেই। রুথ চীৎকার করে বলল, খুলে দাও আমাকে— খুলে দাও—

আপনাকে খুলে দেব বলে এখানে বসানো হয়নি মহামান্য রুথ।

কেন বসিয়েছ?

এই পোশাকে মানুষ দীর্ঘকাল নিরাপদে বেঁচে থাকতে পারে। আপনাকে আমি দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখতে চাই। আমি চাই না আপনি কোনভাবে আত্মহত্যা করুন। আপনাকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিয়ে আমি বাঁচিয়ে রাখব। এই পোশাকের ভিতর আপনি অত্যন্ত নিরাপদ মহামান্য রুথ।

রুথের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠে। ভয়ার্ত গলায় বলল, ত্রিনিত্রি তুমি কেন এ রকম করছ? কেন?

আমি ত্রিনিত্রি নই মহামান্য রুথ।

তু-তুমি কে? রুখের গলা কেঁপে গেল হঠাৎ।

আমি গু।

গু? রুখ ভাঙা গলায় বলল, তুমি কি চাও গু? তুমি আমাকে কোথায় নিতে চাও?

নরকে। সেটি কোথায় আমি জানি না, আমি তোমাকে নিয়ে খুঁজে দেখতে চাই।

মহাকাশযান গভীর অন্ধকারে ঢেকে গেছে। রুখ কাতর গলায় বলল, গু, আমায় ক্ষমা কর গু।

মানুষ মানুষকে ক্ষমা করতে পারে, আমি আর মানুষ নই রুখ। তুমি নিজের হাতে আমাকে একটা যন্ত্রের সাথে জুড়ে দিয়েছ।।

ভুল করেছি আমি ভুল করেছি- রুখ ভাঙা গলায় বলল, আমায় ক্ষমা কর-

কি চাও তুমি?

আলো শুধু একটু আলো- অন্ধকারকে আমার বড় ভয় করে।

বেশ।

খুব ধীরে ধীরে মহাকাশযানে ঈষৎ ঘোলাটে একটু হলুদ আলো জ্বলে উঠে। মহাকাশযানে কৃত্রিম মহাকর্ষ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে- ইতস্ততঃ ভাসছে সব কিছু। শীতল কক্ষ থেকে একটা ক্যাপসুল ভেসে এসেছে। সেখানে গুয়ের দেহ রাখা ছিল, ক্যাপসুলটির ঢাকনা খুলে গেছে ভিতর থেকে গুয়ের মৃতদেহটি বের হয়ে এসেছে তাই। চোখ দুটি বন্ধ করে দেয়া হয়নি তাই মনে হচ্ছে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে রুখের দিকে।

রুখ চোখ বন্ধ করে অমানুষিক চীৎকার দিল একটি।

মহাকাশযানটি নরকের খোঁজে ছুটে যাচ্ছে মহাকাশ দিয়ে, যদিও তার কোন প্রয়োজন ছিল না।

ওমিক্রণিক রূপান্তর

ইলেনের ঘুম ভাঙল তার সবচেয়ে প্রিয় সুরটি শুনে, কিনস্কীর নবম সিম্ফোনী। বার বছর আগে শীতল ঘরে ঘুমিয়ে যাবার আগে মহাকাশযানের কম্পিউটার ক্রিকিকে সে এই সঙ্গীতটির কথা বলে দিয়েছিল। শীতল ঘরে ঘুমন্ত কাউকে জাগিয়ে তোলার সময় চেষ্টা করা হয় তার প্রিয় সুরটি বাজাতে, সে রকমই নিয়ম। ইলেন খুব ধীরে ধীরে চোখ খুলল, ক্যাপসুলের ভিতর খুব হালকা একটা মায়াবী আলো। এর মাঝে চার বছর পার হয়ে গেছে? ইলেনের মনে হল মাত্র সেদিন সে ক্যাপসুলে উপাসনার ভঙ্গীতে দুই হাত বুকের উপর রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখনও দুই হাত বুকের উপর রাখা। হাত দুটি নিজে থেকে নাড়াবে কিনা বুঝতে পারছিল না, ঠিক তখন কম্পিউটার ক্রিকির কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, শুভ জাগরণ, মহামান্য ইলি।

শুভ জাগরণ? ইলেন এই অভিনব সম্ভাষণ শুনে একটু হকচকিয়ে গেল। কে জানে, কেউ যদি চার বৎসর পর ঘুম থেকে জেগে উঠে তাকে সত্যিই হয়তো এভাবে সম্ভাষণ জানানো যায়। মহামান্য ইলেন, আপনি কি রকম অনুভব করছেন?

ভাল।

চমৎকার। আপনি নিজে থেকে শরীরের কোন অংশ নাড়াবেন না। দীর্ঘদিনের অব্যবহারে আপনি শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাময়িকভাবে দুর্বল অনুভব করতে পারেন। আমি আগে একটু পরীক্ষা করে নিতে চাই।

বেশ।

গত চার বৎসর আমি আপনার শরীরের যত্ন নিয়েছি, কাজেই কোন ধরণের সমস্যা হবার কথা নয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পরীক্ষা করে নিশ্চিত না হচ্ছি আপনি শুয়ে থাকেন।

বেশ।

শরীরের নানা অংশে লাগানো নানা প্রোব দিয়ে ক্রিকি নানা ধরণের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠাতে থাকে। ইলেন ধৈর্য ধরে শুয়ে রইল, দুই পায়ে প্রথমে ঝিঁ ঝিঁ ধরার মত একটা অনুভূতি হয়, দুই হাতে খানিকটা মৃদু কম্পন, কানের মাঝে একবার

খানিকটা ঝোড়া শব্দ হল তারপর এক সময় সব কিছু থেমে গেল। ক্রিকির কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেল ইলেন, চমৎকার মহামান্য ইলেন। সব কিছু ঠিক আছে।

শুনে খুশী হলাম। এখন কি উঠতে পারি?

পারেন। তবে হঠাৎ করে উঠবেন না। খুব ধীর ধীরে। প্রথমে বাম হাত উপরে তুলুন। তারপর ডান হাত—

ইলেন ঘন্টাখানেক পর মহাকাশযানের বিশেষ ঢিলে ঢালা একটা কাপড় পরে জানালার কাছে এসে বসে। সুদীর্ঘ অভিযান শেষ করে এই মহাকাশযানটি এখন পৃথিবীর দিকে ফিরে যাচ্ছে, ইলেনকে ঘুম থেকে তোলা হয়েছে সেজন্যে। বাইরে নিরন্ধ্র কালো অন্ধকারে অসংখ্য নক্ষত্র স্থির হয়ে জ্বলছে। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে কেমন জানি মন খারাপ হয়ে যায়। একটা বলকারক পানীয় খেতে খেতে ইলেন মহাকাশযানের লগ পরীক্ষা করছিল। গত চার বৎসরে কি কি ঘটেছে সব এই লগে তুলে রাখা হয়েছে। বেশীর ভাগই বৈজ্ঞানিক তথ্য, এক নজর দেখে চট করে বোঝার মত কিছু নয়। পৃথিবীতে পৌঁছে সেখানকার বড় কম্পিউটারে দীর্ঘ সময় এগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে হবে। তিন বৎসরের মাথায় একটা বড় গোছের গ্রহ কণিকার সাথে প্রায় সামনা সামনি ধাক্কা লেগে যাবার আশঙ্কা হয়েছিল সেটি ছাড়া পুরো সময়টাকে বলা যেতে পারে বৈচিত্রহীন। মহাকাশ অভিযানের প্রথম দুই বৎসর ইলেন শীতল কক্ষের বাইরে ছিল। সেই সময়টুকুর স্মৃতি তার কাছে খুব সুখকর নয়। দীর্ঘ সময়ের প্রস্তুতির পরে, মহাকাশযানের একাকীত্ব তার কাছে একেবারে অসহনীয় মনে হয়েছিল। এত দীর্ঘ যাত্রায় সাধারণতঃ সঙ্গী দেয়া হয় না, অতীতে দেখা গিয়েছে সেটি জটিলতা বাড়িয়ে দেয়।

ইলেন মনিটরটি বন্ধ করে মহাকাশযানের কম্পিউটার ক্রিকিকে ডাকল, ক্রিকি।

বলুন মহামান্য ইলেন।

পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ হয়েছে?

এই মাত্র হল। আমি নিশ্চিত হবার জন্যে আরেকবার খবর পাঠিয়েছি।

চমৎকার। পৃথিবীটা তাহলে এখনো বেঁচে রয়েছে।

ইলেন কথাটি ঠিক ঠাট্টা করে বলেনি। পৃথিবীর অস্তিত্ব নিয়ে একটা আশঙ্কা সব সময় তার বুকে দানা বেঁধে আছে। সে এই মহাকাশযানে করে যখন পৃথিবীর ছেড়ে এসেছিল তখন পৃথিবীর অবস্থা ছিল খুব করুণ। শিল্প বিপ্লবের পর সারা পৃথিবীতে অসংখ্য কলকারখানা গড়ে উঠেছিল, তাদের পরিত্যাক্ত রাসায়নিক জঞ্জালে সারা পৃথিবী এত কলুষিত হয়েছিল যে মানুষের পক্ষে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকা এক রকম অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং পারমাণবিক শক্তি চালিত অসংখ্য কলকারখানা থেকে যে পরিমাণ তেজস্ক্রীয়তা পৃথিবীর বাতাসে স্থান লাভ করেছে তাঁর পরিমাণ ভয়াবহ। কাজেই

পৃথিবী এখনো বেঁচে আছে এবং মহাকাশযানের সাথে যোগাযোগ হয়েছে সেটা নিঃসন্দেহে ইলেনের একটা বড় স্বস্তির কারণ। সে ক্রিকিকে বলল, যোগাযোগটা আরেকটু ভাল করে হোক, তখন চেষ্টা কর একজন মানুষের সাথে কথা বলতে। যদি মানুষ পাওয়া যায়, আমাকে কথা বলতে দিও।

ঠিক আছে মহামান্য ইলেন।

খুব ইচ্ছে করছে একজন সত্যিকার মানুষের সাথে কথা বলতে।

বিচিত্র কিছু নয়, আপনি প্রায় ছয় বৎসর কোন মানুষের সাথে কথা বলেননি।

হ্যাঁ, তার মাঝে অবশ্যি চার বৎসর ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিয়েছি।

মহাজাগতিক রশ্মি ব্যবহার করে মহাকাশযানটির গতিবেগ অবশ্যি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কাজেই পৃথিবীতে এর মাঝে অনেকদিন পার হয়ে গেছে।

সেটা সত্যি। আমি যাদের পৃথিবীতে ছেড়ে এসেছি, তাদের কেউ বেঁচে নেই।

যারা শীতল ঘরে নেই তারা ছাড়া।

শীতল ঘরে আর কতজনই বা যায়। ইলেন খানিক্ষণ মনে মনে হিসেব করে বলল, পৃথিবীতে এর মাঝে একশ' দশ বৎসর পার হয়ে গেছে। তাই না?

একশ দশ বৎসর চার মাস তেরোদিন। আরো যদি নিখুঁত হিসেব চান তাহলে তেরোদিন চার ঘন্টা উনিশ মিনিট একুশ সেকেন্ড।

দীর্ঘ সময়। কি বল?

হ্যাঁ মহামান্য ইলেন। দীর্ঘ সময়।

ইলেন খানিক্ষণ আনমনা হয়ে বসে থাকে। একটু পর আস্তে আস্তে বলে, বুঝলে ক্রিকি, আমার স্ত্রী যখন একসিডেন্টে মারা গেল, মনে হল বেঁচে থেকে কি হবে। এই অভিযানটিতে তখন নিজে থেকে নাম লিখিয়েছিলাম। না হয় কি কেউ এরকম একটা অভিযানে যায়? পৃথিবীতে এক শতাব্দীর বেশী সময় পর ফিরে যাওয়া অনেকটা নতুন একটা জীবনে ফিরে যাওয়ার মত। এতদিনে পৃথিবীর নিশ্চয়ই অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কি বল?

নিশ্চয়ই।

খুব কৌতূহল হচ্ছে দেখার জন্যে।

খুবই স্বাভাবিক।

ইলেন তার প্রাত্যহিক কাজে ফিরে যাবার আগে বলল চেষ্টা করতে থাকে একজন সত্যিকার রক্ত মাংশের মানুষ খুঁজে বের করতে। খুব ইচ্ছে করছে একজন মানুষের সাথে কথা বলতে।

চেষ্টা করছি মহামান্য ইলেন।

সপ্তাহ দুয়েক পর ক্রিকি পৃথিবীর একজন সত্যিকার মানুষের সাথে ইলেনের যোগাযোগ করিয়ে দেতি পারল। আন্তগ্রহ যোগাযোগ বিভাগের একজন বিজ্ঞানী।

মধ্যবয়সী একজন হাসিখুশী মানুষ। ইলেন প্রাথমিক সম্ভাষণ বিনিময় শেষ করে বলল, পৃথিবীতে এখন কোন ঋতু চলছে?

বসন্ত। ভারী বাজে সময়।

কেন বাজে সময় হবে কেন? বসন্ত ফুল ফোটার সময় সেটাই তো বাজে। ফুলের পরাগ রেণুতে বাতাস ভারী হয়ে আছে। দেশ সুদ্ধ মানুষের এলার্জী। হাঁচি দিতে দিতে একেক জনের কি অবস্থা।

ইলেন শব্দ করে হাসে, কি বলছেন আপনি। মহাকাশযানের একেবারে পরিশুদ্ধ বাতাসে আমি ছয় বছর থেকে আছি। এই ছয় বছরে একটিবারও হাঁচি দিইনি। আমিতো ফুলের পরাগ ওঁকে কিন্তু হাঁচি দিতে আপত্তি করব না।

বিজ্ঞানী ভদ্রলোক নিরস মুখে বললেন, দূর থেকে ওরকমই মনে হয়। এলার্জী জিনিসটা খুব খারাপ। সবাই বলছে আইন করে ফুলের পরাগ বন্ধ করে দেয়া হোক।

ইলেন হো হো করে হেসে উঠে, ভালই বলেছেন, আইন করে ফুলের পরাগ বন্ধ করে দেয়া হবে। কয়দিন পরে শুনব যা কিছু খারাপ, আইন করে বন্ধ করে দেয়া হবে। রোগ শোক দুঃখ কষ্ট জরা ব্যাধি, পাপ গ্লানি সব বেআইনী—

বিজ্ঞানী ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বললেন, কেন, আপনি এত হাসছেন কেন? আমি তো কিছু দোষ দেখি না আইন করে কিছু খারাপ জিনিস বন্ধ করে দেয়ায়। কলকারখানা বাতাসে কি পরিমাণ বিষাক্ত গ্যাস ছড়াতো মনে আছে? আইন করে সেসব বন্ধ করে দেয়া হল না? এখন বাতাস কত পরিষ্কার। মাঠে ঘাস জন্মেছে, আকাশে পাখী উড়ছে, নদীতে মাছ।

ইলেন উজ্জ্বল চোখে বলল, সত্যি? আমি যখন পৃথিবী ছেড়েছি কি ভয়াবহ অবস্থা পৃথিবীতে। নিঃশ্বাস নেয়ার অবস্থা ছিল না।

সব পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। এলে চিনতে পারবেন না। কলকারখানার জঞ্জাল তেজস্ক্রিয় বিষাক্ত গ্যাস কিছু নেই। ঝকঝকে একটা পৃথিবী। সত্যি কথা বলতে কি একটু বেশী ঝকঝকে। গাছপালা ফুল ফল একটু কম হলেই মনে হয় ভাল ছিল

ইলেন বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের সাথে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে খানিক্ষণ কথা বলে জিজ্ঞেস করে বলল, গত একশ বছরে বিজ্ঞানের সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি কি বলতে পারেন?

গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার? বিজ্ঞানী ভদ্রলোক একটু বিভ্রান্ত হল। মাথা চুলকে বললেন, গত একশ বছরে সত্যি কথা বলতে কি সেরকম বড় কোন আবিষ্কার হয়নি। অন্ততঃ আমার তো মনে পড়ে না। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে কিছু নতুন জন্তু জানোয়ার তৈরি হয়েছে কিন্তু সেটা তো বড় আবিষ্কার হল না, কি বলেন?

পদার্থ বিজ্ঞানে? রসায়ন? ইঞ্জিনিয়ারিং?

পদার্থ বিজ্ঞানে ব্ল্যাক হোল নিয়ে বড় একটা আবিষ্কার হয়েছে, ল্যাবরেটরীতে ব্ল্যাক হোল তৈরী করা জাতীয় ব্যাপার। আমি ঠিক বুঝি না সেসব। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অনেক কিছু হয়েছে কোনটা বলি আপনাকে? কম্পিউটারের নতুন মডেলগুলো অসাধারণ, আপনার মহাকাশযানের কম্পিউটার এখন হাতের রিষ্টওয়াচে এঁটে যায়।

এরকম কোন আবিষ্কার নেই যেটা অন্য দশটা আবিষ্কার থেকে আলাদা করে বলা যায়?

নিশ্চয়ই আছে, এক সেকেন্ড অপেক্ষা করেন আমি ডাটা বেস থেকে বের করে আনি। বিজ্ঞানী ভদ্রলোক খানিক্ষণ কি একটা দেখে মাথা চুলকে বললেন, ভারী আশ্চর্য ব্যাপার।

কি হয়েছে?

এখানে লেখা রয়েছে, গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার 'ওমিক্রণিক রূপান্তর'। এই আবিষ্কর নাকি পৃথিবী এবং মানুষ জাতিকে নুতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।

সেটা কি?

বিজ্ঞানী ভদ্রলোক অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে একটু হেসে বললেন, মজার ব্যাপার শুনবেন? আমি কখনো এর নাম পর্যন্ত শুনিনি। এই প্রথম শুনলাম ওমিক্রণিক রূপান্তর। কি আশ্চর্য একটা নাম। যে আবিষ্কার মানব জাতির জন্যে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে সেটার নাম পর্যন্ত আমি শুনিনি কি লজ্জার ব্যাপার বলেন দেখি!

লজ্জার কি আছে। আবিষ্কারটি নিশ্চয়ই আপনার বিষয়ে নয়—

নিশ্চয়ই নয় নিশ্চয়ই জীবন বিজ্ঞান বা ডাক্তারী শাস্ত্রের কিছু হবে। আপনি অপেক্ষা করুন আমি বের করে আনি ব্যাপারটা কি, এই ডাটা বেসেই আছে।

ইলেন বলল, আপনাকে বের করতে হবে না, আমি পরে বের করে নেব। আমার সময় পার হয়ে গেছে, যোগাযোগ কেটে দিচ্ছে এক্ষুণি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

আপনার পৃথিবীতে ফিরে আসা অনেক আনন্দের হোক।

সত্যিকার একজন মানুষের সাথে কথা বলে ইলেনের বেশ লাগল। বড় কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ হলে প্রয়োজনীয় সব তথ্য নিখুঁত ভাবে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনীয় তুচ্ছ একটা খবরের জন্যে মনটা বুভুক্ষু হয়ে থাকে। সেরকম একটা খবর দিতে পারে শুধু মানুষ যেমন পৃথিবীতে এখন বসন্তকাল, অসংখ্য ফুল ফুটেছে, ফুলের পরাগ রেণু বাতাসে ভাসছে এবং সেই রেণু মানুষের এলার্জী শুরু করেছে। এই নেহায়েৎ অপ্রয়োজনীয় এবং প্রায় অর্থহীন তথ্যটি ইলেনকে হঠাৎ করে একেবারে মাটির পৃথিবীর কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

বড় ভাল লেগেছে শুনে যে বড় বড় কলকারখানার আবর্জনা এবং জঞ্জাল পৃথিবীকে পুরোপুরি কলুষিত করে ফেলবে সেরকম যে ভয়টা ছিল সেটা এড়ানো গেছে। পৃথিবী আবার বাসযোগ্য হয়েছে, ফুলে ফলে ভরে উঠেছে, শুনে ইলেনের হঠাৎ করে মানব জাতির উপর বিশ্বাস ফিরে এসেছে।

প্রাত্যহিক কাজকর্ম শেষ করে ইলেন মহাকাশযানের কম্পিউটার ক্রিকিকে বলল, পৃথিবীর কেন্দ্রীয় তথ্যকেন্দ্র থেকে ওমিক্রণিক রূপান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বের করে আনতে। ক্রিকি প্রায় বার টেরা বাইট তথ্য বের করে আনল। ইলেন তখন বলল তার মাঝখান থেকে মূল জিনিসগুলি বের করে আনতে। ক্রিকি সেগুলি বের করে আনার পর ইলেন পড়তে বসে।

যেটা পড়ল সেটা খুব বিচিত্র।

বিশে শতাব্দীর শেষের দিকে প্রথম শ্রেণীর কম্পিউটারে কিছু প্রোগ্রাম লেখা হয়েছিল যেটা প্রায় একজন সত্যিকার মানুষের মত চিন্তা ভাবনা করতে পারত। ধীরে ধীরে সেটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে এরকম একটা প্রোগ্রামের সাথে যোগাযোগ করে কোনভাবে বলা সম্ভব হত না সেটি কি মানুষ না একটি কম্পিউটার। প্রোগ্রামটি এমন ভাবে লেখা হবে যেন সেটি একজন নির্দিষ্ট মানুষের মত চিন্তা করতে পারে। দীর্ঘদিন গবেষণার পর ব্যাপারটি এত নিখুঁত রূপ নিয়ে নিল যে আক্ষরিক অর্থেই একজন মানুষের মস্তিষ্ককে তার পুরো ক্ষমতা সহ একটি কম্পিউটারের মেমোরিতে বসিয়ে দেয়া যেত। একজন জৈবিক মানুষকে, কম্পিউটারের ভিতরে এই ধরনের যান্ত্রিক রূপ দেয়ার নাম ওমিক্রণিক রূপান্তর।

ওমিক্রণিক রূপান্তর ব্যবহার করে মানুষের মস্তিষ্ক সংরক্ষণ করার নানা ধরনের ব্যবহারিক গুরুত্ব থাকার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেটি একেবারেই কোন কাজে এল না। কেন এল না তার কারণটি খুব সহজ। ওমিক্রণিক রূপান্তর করে তৈরি করা কম্পিউটার প্রোগ্রামটি এবং সত্যিকার মস্তিষ্কের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। মানুষের প্রকৃত মস্তিষ্ককে কখনো শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয় না, বাইরের জগৎকে সবসময়েই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারে। কিন্তু ওমিক্রণিক রূপান্তরে তৈরী মানুষের মস্তিষ্কের অনুলিপির সে ক্ষমতা নেই। শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কোন একটি কম্পিউটারের মেমোরিতে বেঁচে থাকা তাদের কাছে ভয়াবহ অমানুষিক অত্যাচারের মত। যেন কোন মানুষকে হঠাৎ করে আলোহীন শব্দহীন এক অতল গহবরে ফেলে দেয়া হয়েছে এবং সেখান থেকে তারা বাইরের কোন কিছুর সাথে কোনদিন যোগাযোগ করতে পারছে না। সেই অনুভূতি এত ভয়ানক যে ওমিক্রণিয়াম রূপান্তর করে তৈরি করা মস্তিষ্কের প্রতিটি অনুলিপি প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র নিজেদের ধ্বংস করে ফেলেছিল।

প্রথমে সবাই ভেবেছিল ওমিক্রণিক রূপান্তর করে তৈরী মস্তিষ্কের অনুলিপিগুলিকে দেখা শোনার এবং কথা বলার সুযোগ করে দেয়া হলেই হয়তো এই সমস্যার সমাধান হবে। দেখা গেল সেটা সত্যি নয়। এই ধরনের মস্তিষ্কের অনুলিপি সবসময়েই অনুভব করেছে তারা পুরো জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের দেহ নেই বলে তাদের অস্তিত্ব নেই। কৃত্রিম উপায়ে তারা যা দেখে বা যা শুনে তার সাথে বাস্তব জগতের কোন মিল নেই। সে কারণে সবসময়েই তারা ভয়াবহ বিষণ্ণতায় ডুবে রয়েছে।

ওমিক্রণিক রূপান্তর করে তৈরী মস্তিষ্কের অনুলিপি গুলিকে বিষণ্ণতা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল বিচিত্রভাবে, অনেকগুলি মস্তিষ্কের অনুলিপিকে এক কম্পিউটারে নিজেদের মাঝে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেয়ার পর। দেখা গেল হঠাৎ করে কম্পিউটারের ভিতর একটা ছোট সমাজ গড়ে উঠেছে। মস্তিষ্কের অনুলিপিগুলির মাঝে প্রথমে পরিচয় হল তারপর বন্ধুত্ব হল এবং সবশেষে একে অন্যকে অসহনীয় বিষণ্ণতা থেকে টেনে তুলতে শুরু করল।

তখন হঠাৎ করে ওমিক্রণিক রূপান্তরের সবচেয়ে বড় সাফল্যটি আবিষ্কৃত হল। কম্পিউটারের মাঝে বেঁচে থাকা মস্তিষ্কের অনুলিপিদের বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই, তাদের জন্যে প্রয়োজন কম্পিউটারের ভিতরে একটা জগৎ। পৃথিবীর কম্পিউটার প্রোগ্রামাররা তখন কম্পিউটারের মাঝে একটা জগৎ তৈরী করার কাজে লেগে গেলেন। বিচিত্র সব প্রোগ্রাম লেখা হল। মস্তিষ্কের অনুলিপিগুলির জন্যে তৈরী হল শরীর, কম্পিউটার প্রোগ্রামে। পুরুষের জন্যে পুরুষের দেহ, নারীর জন্যে নারীর। সেই সব শরীর, কম্পিউটারের ভিতরে এক কাল্পনিক জগতে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর গাছপালা তৈরী হল কম্পিউটার প্রোগ্রামে। আকাশ তৈরী হল, বাতাস তৈরী হল, দিন রাত ঋতু তৈরী হল। সত্যিকার মানুষের মস্তিষ্কের নিখুঁত অনুলিপি একটা শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকল। সেই জগতে তারা ভুলে গেল তাদের দেহ, তাদের চারপাশের জগৎ কোন এক প্রোগ্রামারের সৃষ্টি। তাদের মনে হল তারা সত্যিকারের মানুষ, তাদের চারপাশের জগৎ সত্যিকারের জগৎ। সেই সব মানুষের মাঝে দুঃখ বেদনা হাসি কান্না খেলা করতে থাকে। তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরের সেই জগতে নিজেদের জন্যে নতুন একটা জগৎ তৈরী করে নেয় সত্যিকার জগতের সাথে তার আর কোন পার্থক্য নেই।

ইলেন রুদ্ধশ্বাসে ওমিক্রণিক রূপান্তর নামের সেই বিচিত্র গবেষণার কথা পড়তে থাকে। পৃথিবীর দিকে ছুটে যাওয়া এই মহাকাশযানের নিঃসঙ্গ যাত্রীটি সময়ের কথা ভুলে যায়।

পৃথিবীর খুব কাছাকাছি এসে ইলেন আবার পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে যোগাযোগ করল। এবারে তার কথা হল একজন কমবয়সী মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি কোন কারণে খুব বিচলিত।

বলল, আপনি খুব ভাল আছেন, মহাকাশে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেন খামাখা পৃথিবীতে ফিরে আসছেন?

কেন? কি হয়েছে?

আজকের সন্ধ্যের খবর। লেজার কলে চাকরী করে একজন মানুষ, কাজকম করে না বলে চাকরী গেছে। সেই মানুষ ক্ষেপে গিয়ে এগারোটা মানুষ খুন করে ফেলল। চিন্তা করতে পারেন?

ইলেন জিব দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বলল, কি দুঃখের ব্যাপার।

হ্যাঁ। এদের সহ্য করা হয় বলেই তো এই অবস্থা।

সহ্য করা না করা তো প্রশ্ন নয়। এরকম একজন দুজন মানুষতো সবসময়েই থাকবে এদের মনে হয় পুরো মানসিক ভারসাম্যতা নেই। হঠাৎ হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এরকম এক আধটা অঘটন ঘটায়।

কিন্তু কেন ঘটতে দেয়া হবে?

কিন্তু তো করার নেই। এদের বিরুদ্ধে তো কিছু করার নেই।

কেন থাকবে না? অবশ্যি আছে।

আছে? ইলেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি করার আছে আইন করে দেয়া হবে যে এরকম মানুষ আর কখনো জন্মাতে পারবে না।

আইন করে- ইলেন থতমত খেয়ে যায়, মেয়েটা কি বলছে? আইন করে মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষের জন্ম বন্ধ করে দেবে?

আমি দুঃখিত, আপনি এতদিন পর পৃথিবীতে ফিরে আসছেন অথচ এরকম মন খারাপ করে দেয়া কথা বলছি। আমি দুঃখিত।

দুঃখিত হবার কি আছে। এসব হচ্ছে বেঁচে থাকার মাশুল—

সেটাইতো কথা। কেন দুঃখ কষ্ট জীবনের মাশুল হবে? আইন করে কেন জীবন থেকে সব দুঃখ কষ্ট সরিয়ে দেয়া হবে না?

ইলেন চুপ করে থাকে। কেন মেয়েটা এরকম কথা বলছে? জীবন থেকে সব দুঃখ কষ্ট আইন করে সরিয়ে দেবে মানে? এর আগেও মধ্য বয়স্ক সেই বিজ্ঞানী একই কথা বলছিল—তখন ভেবেছিল ঠাট্টা করে বলছে। তাহলে কি সত্যি বলেছিল?

হঠাৎ ইলেনের বুকের ভিতর কেমন জানি একটা অদ্ভুত অনুভূতির জন্ম হয়।

মহাকাশযানটি নিরাপদে মহাকাশ কেন্দ্রে অবতরণ করল। ইলেন খানিক্ষণ অপেক্ষা করে। এরকম দীর্ঘ অভিযানের পর সাধারণত মহাকাশ কেন্দ্রের কর্মকর্তারা দরজা খুলে অভ্যর্থনা করে, আজ কেউ এল না। ইলেন নিজেই দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠে—

সামনে বিস্তীর্ণ ধুসর প্রাণহীন পৃথিবী। ক্রেদাক্ত আকাশ দূষিত পূতিগন্ধময় বাতাস আগুনের হলকার মত বইছে। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও কোন প্রাণের চিহ্ন নেই। বিষাক্ত বাতাসে ইলেনের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে চোখে জ্বালা করতে থাকে, কোন মতে দুহাতে মুখ ঢেকে সে মহাকাশযানের ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। কোথায় এসেছে সে? কাঁপা গলায় ডাকল, ক্রিকি—

বলুন মহামান্য ইলেন।

বাইরে দেখেছ?

দেখেছি। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিবেশ। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কম, প্রচুর কার্ব ডাই অক্সাইড। সাথে নাইট্রাস অক্সাইড এবং সালফার ডাই অক্সাইড। চারপাশে ভয়ানক তেজস্ক্রিয়তা, সিজিয়াম ১৩৭ এর পরিমাণ দেখে মনে হয় পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে। এখানে সূর্যের আলোতে আল্ট্রা ভায়োলেট-বি এর পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, মনে হয় বায়ু মন্ডলের ওজোনের স্তর পুরোপুরি ভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। মহামান্য ইলেন, এই গ্রহ মানুষের বাসের পক্ষে পুরোপুরি অনুপযুক্ত। এখানে আমি যতদুর দেখেছি কোন প্রাণের চিহ্ন নেই।

কি বলছ তুমি?

আমি দুঃখিত মহামান্য ইলেন, কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি।

কিন্তু আমি মাত্র সেদিন পৃথিবীর সাথে কথা বলছি—

আমি এখনো তাদের সাথে কথা বলছি মহামান্য ইলেন।

আপনি বলবেন?

বলব। ভয়ার্ত গলায় ইলেন বলল, বলব।

সাথে সাথে মনিটরে হাসিখুশী একজন মানুষকে বড় মনিটরে দেখা গেল। মানুষটি বলল, আমি কিম রিগার। পৃথিবীর পক্ষ থেকে আপনাকে আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি সম্মানিত ইলেন।

কি।

বলুন।

তোমরা কোথায়?

মানে?

আমি আটকে দেখছি না কেন? পৃথিবী এরকম ভয়ঙ্কর প্রাণহীন কেন? বাতাসে বিষাক্ত গ্যাস—

কিমকে এক মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত দেখায়। সামনে সুইচ বোর্ডে দ্রুত কিছু সুইচ স্পর্শ করে নিজেকে সামলে নেয়। মুখে জোর করে একটা হাসি টেনে এনে বলল, আমাদের ছোট একটা ভুল হয়ে গেছে।

ভুল?

হ্যাঁ, অনেকদিন করা হয়নি তাই। ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা ভুল।

কি ভুল?

আপনার ওমিক্রনিক রূপান্তর করা হয়নি। তাহলে আপনি আমাদের পৃথিবীতে অবতরণ করতে পারেন। আপনি ভুল পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন, সেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে বহুকাল আগে। শিল্প বিপ্লবের অভিশাপে সেই পৃথিবী এখন প্রাণহীন। আপনি সেই ভুল পৃথিবীতে পা দিয়েছেন, বাইরে বের হলে আপনি দশ মিনিটের মাঝে প্রান হারাবেন, বিষাক্ত ফসজিন গ্যাসের নতুন একটা আস্তরণ তৈরী হচ্ছে এই মুহূর্তে।

ভুল পৃথিবী?

হ্যাঁ। আমরা এখন নুতন পৃথিবী তৈরি করেছি।

নতুন পৃথিবী?

হ্যাঁ। বিশাল টেটরা কম্পিউটার তৈরী হয়েছে মাটির গহ্বরে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সেটা বড় করা হচ্ছে ধীরে ধীরে। সেই মহা কম্পিউটারে গত শতাব্দীতে সব মানুষের ডমিক্রনিক রূপান্তর করা হয়েছে।

সব মানুষের?

হ্যাঁ সব মানুষের। বিষাক্ত গ্যাসে অনুপযুক্ত হয়ে গিয়েছিল পুরানো পৃথিবী। নূতন পৃথিবীতে কোন বিষাক্ত গ্যাস নেই, ভয়াবহ আলট্রা ভায়োলেট রে নেই, তেজস্ক্রিয় জঞ্জাল নেই। এখানে আছে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ, নীল হ্রদ, গহীন অরণ্য বিশাল অতলান্ত সমুদ্র মহাসমুদ্র। আগের পৃথিবীতে যে সব ভুল করা হয়েছিল সব শুধরে নেয়া হয়েছে এখানে আশ্চর্য একটা শান্তি বিরাজ করছে এই পৃথিবীতে—

তোমরা তাহলে মানুষ নও? তোমরা আসলে কম্পিউটার প্রোগ্রাম? তোমাদের পৃথিবীও কম্পিউটার প্রোগ্রাম?

হ্যাঁ, কিন্তু নিখুঁত প্রোগ্রাম। আমরা নিখুঁত মানুষ। আমাদের এই পৃথিবী নিখুঁত পৃথিবী।

নিখুঁত পৃথিবী?

হ্যাঁ। আপনি আসেন, নিজের চোখে দেখবেন। আশ্চর্য একটা শান্তি এই পৃথিবীতে। যা কিছু খারাপ যা কিছু অশুভ আইন করে সরিয়ে দেবার কথা হচ্ছে এই পৃথিবী থেকে। তখন স্বর্গের মত হয়ে যাবে এই পৃথিবী।

স্বর্গের মত?

হ্যাঁ। আপনি আসুন, দেখবেন। আপনাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়ে আছি এখানে। ডমিক্রনিক রূপান্তরের জন্যে প্রস্তুত আছেন আপনি?

ইলেন তার কথার উত্তর দিল না, বিড় বিড় করে বলল, পৃথিবী নেই? মানুষ নেই? মানুষের দুঃখ কষ্ট ভালবাসা কিছু নেই? কিছু নেই?

সৌর জগতের তৃতীয় গ্রহের একমাত্র জীবিত মানুষ ইলেন দুমাস মহাকাশযানের দরজা খুলে বের হয়ে এল। বাইরে আগুনের হলকার মত ভয়ঙ্কর বিষাক্ত বাতাস হু হু করে বইছে তার মাঝে সে মাথা উঁচু করে হাঁটতে থাকে, শৈশবে যে ভালবাসায় পৃথিবীতে সে বড় হয়েছে তাকে যেন খুঁজছে ব্যাকুল হয়ে।

আর কিছুক্ষণের মাঝেই সে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে নীচে। বিষাক্ত বাতাস তার বক্ষ বিদীর্ণ করে চূর্ণ করে দেবে ক্ষতবিক্ষত ফুসফুসকে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠবে তার আশ্চর্য কোমল দেহ। সেই দেহ পড়ে থাকবে ভয়ঙ্কর এক পৃথিবীর বুকে।

যে পৃথিবীকে তার নির্বোধ বাসিন্দারা ধ্বংস করেছে নিজের হাতে।